মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৭

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই (১) মাযলূমের দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ (৩) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ *(আবুদাঊদ হা/১৫৩৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা মাযলূমের দো'আ হ'তে সাবধান থাকো। কেননা তার দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই' *(বুখারী হা/৯৬)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১ম বর্ষ	১ম সংখ্যা
মুহাররম-ছফর	১৪৩৯ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪২৪ বাং
অক্টোবর	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ইসলামী বাড়ীর বৈশিষ্ট্য ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব *-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ* ০৯

♦ ধ্বংসলীলা *-রফীক আহমাদ* ১৪

◈ **সাক্ষাৎকার :**

♦ বাম দলগুলোতে লেনিনের সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে ১৯
-বদরুদ্দীন উমর

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

♦ আরাকানে পুনরায় বিপন্ন মানবতা ২৩
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ **সরেযমীন প্রতিবেদন :**

♦ টেকনাফের পথে-ঘাটে মানবতার করুণ আর্তনাদ! ২৮
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

◈ **মনীষী চরিত :**

♦ মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) ৩০
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :**

♦ খলীফা হারূনুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি *-ইহসান ইলাহী যহীর* ৩৫

◈ **কবিতা :** ৩৯

♦ মাযার ♦ ধর্মের নামে ♦ 'যুবসংঘ' তোমায় ভালবাসি

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪০

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

◈ **মুসলিম জাহান** ৪২

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

মানবতা ভাসছে নাফ নদীতে!

গত ২৫শে আগষ্ট'১৭ শুক্রবার থেকে আরাকানে পুনরায় রোহিঙ্গা নিধন শুরু হয়েছে। সীমান্তবর্তী নাফ নদীতে নিহত রোহিঙ্গাদের শত শত লাশ ভাসছে। ঈদুল আযহার এক সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হওয়ায় এবারের এই নিধনযজ্ঞের প্রতি বাংলাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ব্যাপক সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি ২০১২ ও ২০১৬-তে রোহিঙ্গা বিতাড়নের প্রতি বাংলাদেশ সরকার যতনা অনাগ্রহী ছিল, এবার তার বিপরীত আচরণ দেখা যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেরীতে হ'লেও গত ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে গিয়েছেন এবং তাদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। যা ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। আমরা তাঁর এই ভূমিকাকে স্বাগত জানাই এবং ভবিষ্যতে তাঁকে এই শক্ত ভূমিকায় দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করি।

কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক গণ-আদালতে (পারমানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল-পিপিটি) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মিয়ানমারের একজন বৌদ্ধ মানবাধিকারকর্মী বৃটেন প্রবাসী ড. মং জার্নি যবানবন্দী দিয়ে বলেছেন, জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার ১৯৭৮ সালে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় রোহিঙ্গাদের ফেরত না নিলে অস্ত্র সরবরাহের হুমকি দিয়েছিল। এর চারদিন পরেই জেনারেল নে উইনের সরকার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের দেওয়া ঐ হুমকিকে অবমাননাকর ভেবে চার বছর পর ১৯৮২ সালে তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং তাদেরকে রাষ্ট্রহীন করে। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

ড. মং বলেন, 'আমার বাড়ী মিয়ানমারের মান্দালয় এলাকায়। জার্মানীতে হিটলার বলেছিলেন, ইহূদীরা জার্মান নয়। কিন্তু ইহূদী হিসাবেই তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সেদিক থেকে রোহিঙ্গাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী তাদের রোহিঙ্গা পরিচয়ে হত্যা করতেও রাযী নয়'। তিনি বলেন, ১৯৪৮-১৯৬২ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারে একটা উদারনৈতিক গণতন্ত্র ছিল। কিন্তু নে উইন ১৯৬২-তে সামরিক অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা নেওয়ার পরই রোহিঙ্গাদের দুর্দশা চূড়ান্ত হয়। সেই থেকে রোহিঙ্গারা Slow genocide বা 'মন্থর গণহত্যা'র শিকার। গত ১৮ থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর প্রত্যক্ষদর্শীদের যবানবন্দী, বিভিন্ন প্রামাণ্য দলীল ও সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে গত ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ মিলনায়তনে জনাকীর্ণ আদালতে সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর দায়ে রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় ঘোষণা করা হয়। সেখানে ১৭টি সুফারিশ করা হয়েছে। যেমন (১) মিয়ানমার সরকারের ওপর আশু অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। (২) অং সান সু চির ঘোষিত যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গাসহ সব গোষ্ঠীকে পূর্ণ নাগরিকত্ব দিতে হবে। (৩) মিয়ানমারকে অবশ্যই রোহিঙ্গা মুসলিম, কাচিন খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি তার বৈষম্যমূলক নীতি পরিহার করতে হবে। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন বাতিলসহ ২০০৮ সালের সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে। (৪) মিয়ানমার সরকারের কর্মকর্তাদের ওপর টার্গেটেড নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। (৫) মিয়ানামার সরকার এবং আসিয়ান প্রতিনিধিরা রাখাইনের সব সশস্ত্র গ্রুপকে নিয়ে রাখাইন সীমান্ত বরাবর অঞ্চলের বেসামরিকীকরণ এবং একটি অস্ত্রবিরতির প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। (৬) জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থাকে রাখাইনের ঘটনা তদন্তের অনুমতি দিতে হবে। (৭) মিয়ানমারের পার্লামেন্টে সামরিক প্রতিনিধিদের কোটা বাতিল করতে হবে। (৮) সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশকে পূর্ণ বেসামরিক নিয়ন্ত্রণে আনতে সংবিধানে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। (৯) মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের দায়মুক্তি বন্ধ করে দোষী ব্যক্তিদের বিচার শুরু করতে হবে। (১০) বাস্তুচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে একটি স্বাধীন বেসরকারী কমিশন গঠন করতে হবে। (১১) একটি ফেডারেল কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যে তাদের নিজেদের স্বায়ত্তশাসন নিজেরাই নিশ্চিত করার সামর্থ্য রাখে, সেটা স্বীকার করতে হবে। (১২) মিয়ানমার ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির ধর্মীয় ও মানবাধিকার সংগঠন এবং সাংবাদিকদের রোহিঙ্গা সহ কাচিন ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির এলাকায় প্রবেশাধিকার দিতে হবে। (১৩) বাংলাদেশ সরকারকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসহ রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী পরিচয়পত্র দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে তারা নির্বিচারে গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা পায়। (১৪) অভিবাসন সংকটের দায়ভার আসিয়ান দেশগুলিকে নিতে হবে এবং আসিয়ান সনদ অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের সীমান্ত খুলে দিতে হবে। (১৫) বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং অন্যান্য জাতি যারা রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানিয়েছে, তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দিতে ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীনের মতো সম্পদশালী দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। (১৬) দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। সেই সাথে মানব পাচারকারীদের হাত থেকে বাঁচতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করতে হবে। (১৭) সমস্যার কারণ চিহ্নিত করতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বেসরকারী কমিশন গঠন করতে হবে'। রায় ঘোষণার পর পিপিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট গিয়ানি তোগেনি বলেন, পূর্ব তিমুর ও শ্রীলঙ্কার তামিলদের ক্ষেত্রে পিপিটির তরফে যে ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছিল, সেগুলির রায়ের সুফল তাঁরা পরে অনুধাবন করেছেন। দেরীতে হ'লেও এখানেও ফল মিলবে বলে আমরা আশাবাদী।

আগে থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত চার লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সঙ্গে এবারে যুক্ত হয়েছে আরও সোয়া চার লাখ। ফলে সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালাচ্ছে, যার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর ইহূদী নিধনের তুলনা করা যায়। অথচ এখন কেউ মুসলিম নিধনকারী বৌদ্ধদের 'জঙ্গী' বলছে না। মোদী যুগে ভারতে একজন মুসলিমের জীবনের চাইতে গরুর জীবনের মূল্য বেশী। এরপরেও হিন্দুত্ববাদীরা জঙ্গী নয়। জঙ্গী ও সন্ত্রাসী তকমাটি কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যেরা বোমা মেরে শেষ করলেও দোষ নেই। মুসলমানরা ঢিল মারলেও জঙ্গী। এজন্যই কবি বলেছেন, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے بدنام + وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا 'আমরা আহ্ করলেও বদনাম হয়। আর তারা হত্যা করলেও প্রচার হয় না'।

বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যে শ্লোগানটি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তা ছিল 'বার্মা ফর বার্মিজ'। অর্থাৎ বার্মার সকল অধিবাসীদের জন্যই বার্মা। ১৯৩৬ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা একটি ঐতিহাসিক ছবিতে দেখা যায় যে, বার্মার স্বাধীনতা এসেছিল যাদের হাত ধরে, সেই অল বার্মা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন রোহিঙ্গা নেতা আব্দুর রশীদ। যার পাশে বসে আছেন সাধারণ সম্পাদক সুচির পিতা অং সান। তার বাম পাশে আছেন বার্মা মুসলিম লীগের সভাপতি আব্দুর রাযযাক। এই রোহিঙ্গা নেতা আব্দুর রাযযাক-ই ছিলেন আজকের মিয়ানমারের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নকারী। বার্মার জাতির পিতা ও সুচির পিতা জেনারেল অং সানের গঠিত বার্মার স্বাধীনতা-পূর্ব অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন আব্দুর রাযযাক। ১৯৪৭-এর ১৯শে জুলাই জেনারেল অং সানের সাথে যে ৬ জন মন্ত্রী নিহত হন তাদের মধ্যে আব্দুর রাযযাক ছিলেন অন্যতম। বার্মা আজও রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৯শে জুলাইকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করে থাকে। কেবল আব্দুর রাযযাক-ই নন, সুচির পিতা জেনারেল অং সানের সবচেয়ে ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগীদের মধ্যে আরও

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

Contents

ইসলামী বাড়ীর বৈশিষ্ট্য

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

একজন সত্যিকার মুসলমানের সতত সাধনা থাকে দিন-রাত ইসলামী বিধান মুতাবেক অতিবাহিত করার। তার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সময় ইসলামী শিক্ষার আলোকে অতিক্রম করে এবং এটা তার জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। যাতে দ্বীন ও দুনিয়া সর্বত্র সে কামিয়াবী ও সফলতা লাভ করে এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে। গৃহ প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। মানুষ সেখানে জীবন যাপন করে এবং পরিবার-পরিজনের সাথে বসবাস করে। তাই মানব জীবনে ঘর-বাড়ীর গুরুত্ব ও উপকারিতা বস্তীবাসী, ফুটপাথ, রাস্তার পার্শ্বে, রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্বে বসবাসকারীদের প্রতি খেয়াল করলে অনুধাবন করা যায়। ঘর থেকেই হেদায়াতের আলোকে মানুষের জীবন আলোকিত হয়। কারণ মুসলমান কিভাবে ঘরে প্রবেশ করবে, কিভাবে ঘর থেকে বের হবে, ঘরে কিভাবে থাকবে, ঘরকে জিনিসপত্র কিভাবে রাখবে এবং ঘরে কি করবে প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে কুরআন ও হাদীছে। এজন্য যদি আমরা আমাদের ঘরে ইসলামী শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুশোভিত করি তাহ'লে আমাদের এ ঘর আমাদের জন্য সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ হবে এবং সচ্ছলতা আসবে। সেই সাথে আমাদের সন্তানরা সহজেই ইসলামী শিক্ষার উপরে গড়ে উঠবে।

নিম্নে ইসলামী বাড়ী-ঘরের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল, যাতে মুসলমান নিজের বাড়ী-ঘরকে ইসলামী গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। এমনকি তাকে দাওয়াতের কেন্দ্র ও উত্তম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে তৈরী করতে পারে।

১. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা :

বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার কিছু সুন্নাতী নিয়ম আছে। যা পালন করা হ'লে বাড়ী শয়তানের কবল থেকে হেফাযতে থাকে। দুনিয়াবী বিভিন্ন ফেৎনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকে। নানাবিধ অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ– 'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেলো'।[১]

২. গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া :

সালাম দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এজন্য গৃহে প্রবেশকালে প্রবেশকারী সালাম দিবে, যদিও ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ঐ ঘরে বসবাস না করে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ– 'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রাপ্ত বরকমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন' *(নূর ২৪/৬১)*।

অন্যের গৃহে প্রবেশকালেও সালাম দিবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং এর বাসিন্দাদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(নূর ২৪/২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ على الله. 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযিকপ্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায়'।[২]

এমনকি পরিত্যক্ত ঘরে প্রবেশ করলে বলবে, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ– (আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক)।[৩]

৩. গৃহে সুন্নাত ছালাত সমূহ আদায় করা :

সুন্নাত-নফল ছালাত সমূহ ঘরে আদায় করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ. 'তোমাদের জন্য বাড়ীতে

১. *মুসলিম হা/২০১৮; আবু দাউদ হা/৩৭৬৫; মিশকাত হা/৪১৬১।*
২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৯; আবু দাউদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।*
৩. *মুওয়াত্ত্বা হা/৩৫৩৫; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।*

ছালাত আদায় করা যরূরী। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে ছালাত আদায় করে তাই উত্তম'।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا. 'তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, তখন তার উচিত সে যেন ঘরে কিছু ছালাত আদায় করে। কেননা ঘরে ছালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ এতে কল্যাণ দান করেন'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلاَةُ فِى بَيْتِى أَوِ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ أَلاَ تَرَى إِلَى بَيْتِى مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনটি উত্তম, আমার ঘরে ছালাত আদায় করা অথবা মসজিদে? তিনি বললেন, তুমি কি দেখ না আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও মসজিদে ছালাত আদায় করার চেয়ে ঘরে ছালাত আদায় করা আমার নিকটে অধিক প্রিয়, ফরয ছালাত ব্যতীত'।[৬] তিনি আরো বলেন,. اجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا 'তোমাদের ঘরেও কিছু ছালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না'।[৭]

৪. ঘরে ছবি-মূর্তি না ঝুলানো :

ছবি-মূর্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই এসব থেকে বাড়ী-ঘর মুক্ত রাখা মুমিনের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের ঘর ছবি-মূর্তিতে ভরপুর থাকে। দেওয়ালে নিজের, মৃত পিতা-মাতার, প্রিয় ব্যক্তিত্বের বা নেতার ছবি ঝুলানো থাকে। কখনোবা নেতার প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্যও শোভা পায় মুসলমানদের ঘরে। কখনও শোভা বর্ধনের নামে বিভিন্ন প্রাণী-মূর্তির শোপিচ সাজানো থাকে শোকেচ, আলমারী ও কর্ণার সেলফে। অথচ এসবের জন্য ইহ-পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,- لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমত ও বরকতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ- 'রাসূল (ছাঃ) ছবিপূর্ণ কোন কিছু তাঁর বাড়ীতে দেখলে তা ছিড়ে বা ভেঙ্গে ফেলতেন'।[৯]

তিনি আরো বলেন, قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِيْ عَلَى سَهْوَةٍ لِيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ. 'একদা রাসূল (ছাঃ) সফর হ'তে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা তাকের উপর দিয়ে রেখেছিলাম। রাসূল (ছাঃ) তা দেখে ছিড়ে টুকরা করে দিলেন এবং বললেন, 'যারা ছবি-মূর্তি অংকন করে ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি হবে'।[১০]

অন্যত্র তিনি বলেন, قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ. 'একদা রাসূল (ছাঃ) এক সফর থেকে আসলেন, তখন আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। রাসূল (ছাঃ) সেটা সরিয়ে ফেলতে বললেন, আমি তা সরিয়ে দিলাম'।[১১]

আয়েশা (রাঃ) একটি ছোট বালিশ ক্রয় করেছিলেন, তাতে ছবি আঁকা ছিল। রাসূল (ছাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তওবা করছি। আমি কি পাপ করেছি? (আপনি ঘরে প্রবেশ করছেন না কেন?)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ. 'এই ছোট বালিশটি কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আমি এটা এজন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই যারা এই সমস্ত ছবি তোলে বা অংকন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যাদের তৈরি করেছ তাদের জীবিত কর। তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমত ও বরকতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[১২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি ঘরে প্রবেশ করিনি। কারণ গৃহদ্বারে অনেকগুলি ছবি ছিল এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা টাঙ্গানো ছিল যাতে অনেকগুলি প্রাণীর ছবি ছিল। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। বস্তুতঃ যে ঘরে এ সমস্ত

৪. বুখারী হা/৭৩১; মুসলিম হা/৭৮০।
৫. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৯২।
৬. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৯।
৭. বুখারী হা/৪৩২, ১১৮৭; আবু দাউদ হা/১০৪৩, ১৪৪৮; তিরমিযী হা/৪১৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৪১; মিশকাত হা/৭১৪।
৮. বুখারী হা/৩২২৫, ৩৩২২; মুসলিম হা/২১০৬; মিশকাত হা/৪৪৮৯।
৯. বুখারী হা/৫৯৫২।
১০. বুখারী হা/৫৯৫৪।
১১. বুখারী হা/৫৯৫৫।
১২. বুখারী হা/৫৯৬১।

জিনিস থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না। সুতরাং ঐ সমস্ত ছবিগুলির মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হ'লে গাছের আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে আদেশ দিন তাকে কেটে দু'টি গদি তৈরি করা হয়, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে আদেশ দিন যেন তাকে ঘর থেকে বের করা হয়। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) তাই করলেন'।[১৩] আবু মাসঊদ উক্ববাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَـــهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَـــالَ نَعَـــمْ فَـــأَبَى أَنْ يَّدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّوْرَةَ ثُمَّ دَخَـــلَ. 'এক লোক তাঁর জন্য খাদ্য তৈরী করল। এরপর তাঁকে দাওয়াত দিল। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, শেষ পর্যন্ত ছবি ভেঙ্গে ফেলা হ'ল। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।[১৪]

৫. বাড়ীতে কুকুর প্রতিপালন না করা :

বাড়ীতে কুকুর প্রতিপালন করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। আর এজন্য মুসলমানের নেক আমলের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ– 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমত ও বরকতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[১৫] আর কুকুর প্রতিপালনে বহু নেকী হ্রাস পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ 'যে ব্যক্তি শস্য ক্ষেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফাযতের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল হ'তে এক ক্বীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে'।[১৬] অন্য হাদীছে দুই ক্বীরাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।[১৭] তবে তিনটি কারণে কুকুর পোষা জায়েয। যথা- ১. পশুপাল পাহারা দেওয়া, ২. শস্যক্ষেত পাহারা দেওয়া ও ৩. শিকার করার জন্য।[১৮]

৬. ক্রুস ও ক্রুসের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন কিছু বা অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন না রাখা :

মুসলমান স্বীয় দ্বীনের উপরে বেঁচে থাকে। তার সমস্ত হুকুম-আহকাম ও নির্দেশ মোতাবেক তার দিন-রাত অতিবাহিত করে। শরী'আতে নিষিদ্ধ কোন কাজ সে করে না। এজন্য অন্য কোন ধর্মের প্রতীক দ্বারা সে নিজের গৃহকে সজ্জিত করবে না। বরং সেগুলোকে স্বীয় গৃহ থেকে দূরে রাখবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِى بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ 'নবী করীম (ছাঃ) নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না, যাতে ক্রুসের চিহ্ন বা ছবি থাকত'।[১৯] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ '[ঈসা (আঃ)] ইবনু মারয়াম তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযয়া কর তুলে দিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না'।[২০]

৭. ঘরে চিতাবাঘের চামড়া ঝুলিয়ে বা বিছিয়ে না রাখা :

যেসব জিনিস থেকে ঘরকে মুক্ত রাখা যরূরী তন্মধ্যে চিতাবাঘের চামড়া অন্যতম। মিকদাম ইবনু মা'দীকারীব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে এবং এর চামড়ার তৈরী গদিতে আরোহী হ'তে নিষেধ করেছেন।[২১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ 'তোমরা রেশমের এবং চিতা বাঘের তৈরী গদিতে আরোহী হবে না'।[২২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিতাবাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং স্বর্ণের জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন'।[২৩] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ 'ফেরেশতারা চিতাবাঘের চামড়ার তৈরী আসনে আসিন ব্যক্তির সঙ্গী হয় না'।[২৪]

৮. ঘর বা অন্যত্র বাদ্যযন্ত্র না রাখা :

বর্তমানে ইসলামী জীবন যাপনে যেসব জিনিস অত্যধিক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র। সর্বত্র এসবের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়। আর এসব শোনা ও শুনানোর জন্য বর্তমানে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ বের হয়েছে। সেগুলো মানুষ নিজের উপার্জন থেকে সংগ্রহ করছে। বিভিন্ন প্রকার মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করছে। এসব জিনিস একদিকে মানুষের জীবনযাত্রা অতীব সহজ করে দিয়েছে। অন্যদিকে

---

১৩. *তিরমিযী হা/২৮০৬; মিশকাত হা/৪৫০২, সনদ ছহীহ।*
১৪. *আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১৬৫।*
১৫. *বুখারী হা/৪০০২, ৫৯৪৯; মুসলিম হা/২১০৬; মিশকাত হা/৪৪৮৯ 'পোষাক' অধ্যায়।*
১৬. *বুখারী হা/২৩২২, ৩৩২৪; মুসলিম হা/১৫৭৫; আহমাদ ৯৪৯৮।*
১৭. *বুখারী হা/৫৪৮০-৮২; মুসলিম হা/১৫৭৪-৭৫।*
১৮. *নাসাঈ হা/৪২৯০-৯১, সনদ ছহীহ।*
১৯. *বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১।*
২০. *বুখারী হা/২৪৭৬; মুসলিম হা/১৫৫; মিশকাত হা/৫৫০৫।*
২১. *আবু দাউদ হা/৪১৩১।*
২২. *আবু দাউদ হা/৪১২৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৩৫৭।*
২৩. *আবু দাউদ হা/৪২৩৯, সনদ ছহীহ।*
২৪. *আবু দাউদ হা/৪১৩০, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৯২৪।*

এসবের অপব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যা কেউ রোধ করতে পারছে না। অথচ গান-বাজনা পাপের মূল। এর মাধ্যমে অন্তরে মুনাফিকী পয়দা হয় এবং এটা খারাপ কাজ বৃদ্ধির একটি অন্যতম উৎস। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ 'গান-বাজনা অন্তরে নিফাক্বী সৃষ্টি করে যেমন পানি সবজি উৎপাদন করে'।[২৫]

সুতরাং আমাদের জন্য করণীয় হ'ল আধুনিক এসব আবিষ্কারকে বৈধ কাজে ব্যবহার করা। যেমন মোবাইল ব্যবহার করে আত্মীয়-স্বজনের খবর নেওয়া, কম্পিউটারে বৈধ কাজ করা, টিভিতে ওয়ায-নছীহত শোনা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা ও খবর শোনা যেতে পারে। মোটকথা পাপ কাজ ব্যতিরেকে বৈধ কাজে এসব ব্যবহার করা।

৯. গৃহে স্বর্ণ-রূপার থালা ব্যবহার না করা :

স্বর্ণ-রূপার জিনিস যেমন- থালা-বাটি, পেয়ালা বা এ জাতীয় কোন কিছু ব্যবহার করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ 'যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের অগ্নি প্রবিষ্ট করায়'।[২৬] তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَشْرَبُوْا فِىْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِى صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا– 'তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে তাদের অর্থাৎ অমুসলিমদের জন্য ভোগ্যবস্তু। আর তোমাদের জন্য হ'ল আখিরাতের ভোগ্যবস্তু'।[২৭]

১০. গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া :

অন্যের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া যরূরী। এমনকি মায়ের ঘরে প্রবেশের পূর্বেও অনুমতি নিতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। অনুমতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ মূসা (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আস-সালামূ আলাইকুম আনা (আমি) আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তখন আবার বললেন, আসসালামু আলাইকুম এই যে, আবূ মূসা। আস-সালামু আলাইকুম এই যে আশ'আরী। এরপর (জবাব না পেয়ে) তিনি ফিরে গেলেন। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। ফিরে এলে তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ফিরিয়ে দিল, হে আবূ মূসা? আমরা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, অনুমতি চাও তিনবার। এতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হ'লে ভাল, অন্যথা ফিরে যাও'।

ওমর (রাঃ) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই তুমি আমার কাছে প্রমাণ নিয়ে আসবে। অন্যথা আমি এমন করব তেমন করব, (শাস্তি দিব)। তখন আবূ মূসা (রাঃ) চলে গেলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে বিকালে তাকে তোমরা মিম্বারের কাছে দেখতে পাবে, আর যদি প্রমাণ না পায় তাহ'লে তোমরা তাকে দেখতে পাবে না।

বিকালে তিনি এলে তারা তাকে (মিম্বারের কাছে দেখতে) পেলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আবূ মূসা! কি বলছ? প্রমাণ পেয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ উবাই ইবনু কা'ব! তিনি বললেন, ইনি বিশ্বস্ত।

(তখন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন,) হে আবূ তুফায়েল! তিনি কী বললেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ বলতে আমি শুনেছি। হে ইবনুল খাত্ত্বাব! আপনি কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের জন্য আযাব স্বরূপ হয়ে পড়বেন না। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আমি তা কখনো চাই না)। আমি তো একটি বিষয় শোনার পর সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া পসন্দ করেছি।[২৮] তিন বার প্রবেশের অনুমতি চাওয়া যায় যা উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। এরপর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ– 'যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহ'লে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও! তাহ'লে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' *(নূর ২৪/২৮)*।

১১. মেহমানদারীর জন্য বাড়ীতে আবশ্যকীয় জিনিস রাখা :

মানুষ থাকলে তার আত্মীয়-স্বজন থাকবে এবং বাড়ীতে মেহমানও আসবে। তাই মেহমানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহে রাখা যরূরী। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ– 'একটি শয্যা পুরুষের, দ্বিতীয় শয্যা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি অতিথির জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য'।[২৯]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যরূরী হচ্ছে মেহমানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ীতে সংরক্ষণ করা তাহ'লে মেহমানকে বাড়ী রাখা সম্ভব হবে এবং তার আপ্যায়ন করা সহজ হবে।

---

২৫. আবু দাউদ হা/৪৯২৭; মাওকূফ হিসাবে ছহীহ। দ্র. ইসলাম ওয়েব, ফৎওয়া নং ২৮৩০২১।
২৬. বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫; মিশকাত হা/৪২৭১।
২৭. মুসলিম হা/২০৬৭।
২৮. মুসলিম হা/২১৫৪।
২৯. মুসলিম হা/২০৮৪; আবু দাউদ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/৪৩১০।

Contents

১২. পানাহারে অপচয় থেকে বেঁচে থাকা :

অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ– 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا– 'আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় কৃতঘ্ন' *(ইসরা ১৭/২৬-২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ– 'তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যতক্ষণ না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়'।[৩০] এজন্য মুসলমানের উচিত পানাহারে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা। আর সার্বিকভাবে অপব্যয় এড়িয়ে চলা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ– 'একজনের খাবার ২ জনের জন্য, ২ জনের খাবার ৪ জনের জন্য এবং ৪ জনের খাবার ৮ জনের জন্য যথেষ্ট'।[৩১]

১৩. বসতবাড়ী নির্মাণে প্রতিযোগিতা পরিহার করা :

বাড়ী-ঘর, অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা না করা। জিবরীল (আঃ) ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ– 'দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে (অর্থাৎ সন্তান তার মায়ের নাফরমানী করবে); আর তুমি দেখবে যে, খালি পা ও খালি গায়ের অধিকারী মুখাপেক্ষী রাখাল সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু-উঁচু প্রাসাদ তৈরী করে গর্ব প্রকাশ করবে'।[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِىْ أَنَا وَأُمِّى فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ شَىْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَاكَ. 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ও আমার মা তখন আমার একটি দেয়াল মেরামত করছিলাম। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! কি হচ্ছে? আমি বললাম, মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি দেখছি, নির্দেশ (ক্বিয়ামত বা মৃত্যু)-এর চেয়েও দ্রুত ধাবমান'।[৩৩]

১৪. ঘরে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া :

বাড়ীতে কুরআন তেলাওয়াত বরকত লাভ এবং শয়তান দূর হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ– 'তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হ'তে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়'।[৩৪]

১৫. ঘরের ভিতরের সাপ মারার পূর্বে তা তাড়ানোর চেষ্টা করা :

ঘরের সাপ মারার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া। নবী করীম (ছাঃ) ঘরে বসবাসকারী সাপ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন।[৩৫] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوْا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ– 'মদীনায় জ্বিনদের একটি দল রয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করেছে। তাই যে ব্যক্তি এসব বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী (সাপ ইত্যাদির রূপধারী)-দের কোন কিছু দেখতে পায়, সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক সংকেত দেয়। এরপরও যদি তার সামনে তা প্রকাশ পায়, তবে সে যেন তাকে মেরে ফেলে, কেননা সে একটা (অবাধ্য) শয়তান'।[৩৬]

১৬. ঘরে পরপুরুষ ও নারীতে নির্জনে অবস্থান না করা :

ঘরে নির্জনে পরপরুষ ও পরনারীতে একত্রে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ. 'মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য'।[৩৭] তিনি আরো বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ– 'একজন স্ত্রীলোকের সাথে একজন পুরুষ একাকী থাকলে তাদের মধ্যে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যোগ দেয়'।[৩৮]

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা ফিৎনা। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে নির্জনে একাকী অবস্থান

৩০. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১, সনদ হাসান।
৩১. মুসলিম হা/২০৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৪; মিশকাত হা/৪১৭৮।
৩২. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
৩৩. আবু দাউদ হা/৫২৩৫; মিশকাত হা/৫২৭৫, সনদ ছহীহ।
৩৪. মুসলিম হা/৭৮০।
৩৫. বুখারী হা/৩৩১২-১৩।
৩৬. মুসলিম হা/২২৩৬; আবু দাউদ হা/৫২৫৬, ৫২৫৮।
৩৭. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২।
৩৮. তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮, সনদ ছহীহ।

করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এমতাবস্থায় শয়তান তাকে সুশোভিত করে পেশ করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে যারপর নেই চেষ্টা করে। তাই পরনারীর সাথে একাকী নির্জনে অবস্থান করা সর্বতোভাবে পরিহার করা যরূরী। যাতে শয়তান আমাদেরকে কোনভাবে ভুল পথে পরিচালিত করে পাপে লিপ্ত করতে না পারে।

১৭. ঘর প্রশস্ত করা :

বসবাসের ঘর প্রশস্ত ও বড়সড় হওয়া উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ، 'সৌভাগ্যের বিষয় চারটি; সতী-সাধবী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী, সৎকর্মশীল প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন'।[৩৯] এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, প্রশস্ত গৃহ সৌভাগ্যের প্রতীক। কারণ তাতে বসবাস করে এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অতি দরকারী জিনিস স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيْئَتِهِ– 'সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার জিহ্বাকে সংযত করতে সক্ষম হয়েছে, বাড়ীকে প্রশস্ত করেছে এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করেছে'।[৪০]

১৮. শয্যা গ্রহণের সময় দরজা বন্ধ করা, আগুন নিভানো ও খাবার পাত্র ঢেকে রাখা :

ঘুমানোর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কিছু কাজ করতে বলেছেন, প্রত্যেক পরিবারের জন্য তা মেনে চলা যরূরী। কেননা এতে বহু উপকারিতা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخُلُّوْهُمْ، فَأَغْلِقُوْا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوْا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ– 'যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকে রাখ। কেননা এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে, কমপক্ষে পাত্রগুলোর উপর কোন বস্তু আড়াআড়ি করে রেখে দিও। আর (শয্যা গ্রহণের সময়) তোমরা তোমাদের প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিবে'।[৪১]

১৯. বাড়ীকে আল্লাহ্র যিকরের স্থানে পরিণত করা :

ঘর-বাড়ীকে আল্লাহ্র যিকরের স্থানে পরিণত করা প্রতিটি মুসলমানের উপরে করণীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– 'যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দু'টি ঘরের তুলনা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের সঙ্গে'।[৪২] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً– 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসলো অথচ আল্লাহকে স্মরণ করলো না, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহ্র নাম নিলো না তার জন্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা'।[৪৩] উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা অনুমিত হয় যে, ঘর-বাড়ীতে থাকাবস্থায় যতটুকু সময় বা ফুসরত পাওয়া সেটুকু আল্লাহ্র যিকরে ব্যয় করা যরূরী। তাছাড়া প্রতিটি কাজের সাথে সাথে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, দুনিয়াবী জীবনে বসবাসের জন্য বাড়ী-ঘর এক গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। আল্লাহ বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا– 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল' *(নাহল ১৬/৮০)*। এ বাড়ী-ঘরে অবস্থান করা দুনিয়াবী ফিৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَلاَمَةُ الرَّجُلِ فِيْ الْفِتْنَةِ أَنْ يَّلْزِمَ بَيْتَهُ– 'ব্যক্তির নিরাপত্তা হচ্ছে বাড়ীতে বা ঘরে অবস্থান করায়'।[৪৪] বাড়ীতে অবস্থানের ফলে তার থেকে অন্য মানুষ নিরাপদে থাকে এবং সেও শান্তি লাভ করে। তাছাড়া এতে সে আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوْ قَعَدَ فِيْ بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ– 'কিংবা সে তার বাড়ীতে বসে থাকবে তাহ'লে তার থেকে মানুষ নিরাপদে থাকবে এবং সেও নিরাপদে থাকবে'।[৪৫] সুতরাং বাড়ী-ঘরকে ইসলামী গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তুলে সেখানে অবস্থান করলে উপরোক্ত ফযীলত লাভ করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলের বাড়ী-ঘরকে ইসলামী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার তাওফীক দিন-আমীন!

---

৩৯. ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৭৬; ছহীহাহ হা/২৮২।
৪০. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৫৫।
৪১. বুখারী হা/৫৬২৩; মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৪।
৪২. মুসলিম হা/৭৭৯।
৪৩. আবু দাউদ হা/৪৮৫৬; নাসাঈ হা/৬৮৮; মিশকাত হা/২২৭২; ছহীহুল জামে' হা/৬১৩০।
৪৪. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৪৯।
৪৫. আহমাদ হা/২২১৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১২৬৮।

আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব

মূল (উর্দূ) : শায়খ ইরশাদুল হক আছারী
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : নিকট অতীতে যেসকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী প্রসিদ্ধি দান করেছেন এবং স্বীয় বান্দাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন সৌভাগ্যবান হ'লেন ইমাম, আল্লামা, মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (মৃঃ ২২ জুমাদাল আখেরাহ ১৪২০ হিঃ, ২.১০.১৯৯৯ ইং)। আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় তাঁকে আবৃত্ত করুন। যার দ্বারা অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তাদের সংখ্যা স্রেফ আল্লাহ-ই জানেন। পাঁচ ডজনের কাছাকাছি গ্রন্থ তিনি ইলমী উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছেন, যেগুলি মুদ্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহা' সাত খণ্ডে ও 'সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা' চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত। কিছু ভলিউম দুই, তিন খণ্ডে বিভক্ত। এভাবে এই সিলসিলা বৃহদায়তন ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। 'ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল' আট খণ্ডে রচিত। এগুলি ব্যতীত আরো গ্রন্থ রয়েছে।

শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ ছাড়া অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় চার ডজনের বেশী। তাঁর ফাতাওয়াসমূহও ত্রিশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে, যা প্রকাশিতব্য।

হযরত ইমাম শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর ছাত্ররা তাঁর পবিত্র জীবন এবং তাঁর চিন্তাধারার সমর্থনে ও প্রতিরক্ষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেগুলি মুদ্রিত হয়ে (মানুষের) হস্ত গত হয়েছে, তার সংখ্যা ৭৪। মুসলিম বিশ্বের নামী-দামী ব্যক্তিগণ তাঁর সম্পর্কে যে প্রশংসা করেছেন, সেগুলি স্বয়ং এক বৃহৎ রেজিস্ট্রার। অপ্রকাশিত ও উর্দূতে লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ এর চেয়ে বেশী।

এজন্য যদি বলা হয় যে, নিকট অতীতে দ্বীনে হানীফ-এর যতটুকু খেদমত শায়খ আলবানী (রহঃ) আঞ্জাম দিয়েছেন এবং সেগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে তা অন্যের ভাগ্যে কমই জুটেছে, তবে অত্যুক্তি হবে না।

কোন বড় মানুষ সম্পর্কে তিন শ্রেণীর লোক থাকে-

(১) তার প্রতিটি কথাকে গ্রহণকারী এবং তার স্তুতি ও প্রশংসাকারী।

(২) তার প্রতি হিংসা পোষণকারী ও মানুষদেরকে তার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।

(৩) উদারপন্থী ও মধ্যমপন্থী, যারা তার ভাল দিকগুলির স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং এটাও মনে করেন যে, মানুষ হওয়ার দরুন তার ভুলও হ'তে পারে। সুতরাং তার ভাল কর্ম ও অপরিসীম খেদমতের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা একে স্রেফ সমালোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানান না। অবশ্য তার ভুলগুলি সম্পর্কে সতর্ক করার ব্যাপারে তারা কোন দ্বিধা-সংকোচ করেন না। বরং জ্ঞানী-গুণীদের দায়িত্ব হ'ল, সাধারণ জনগণকে এরূপ ভুলসমূহ সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া এবং হক ও ইনছাফের সাথে ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর পথে দিকনির্দেশনা দান করা। আমাদের পূর্বসূরীদের এটিই পথ ও পন্থা। আর এটিই শান্তির পথ।

শায়খ আলবানী *(আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন)* সম্পর্কেও অনেকটাই এরকম ঘটেছে বলে মনে হয়। তাঁর প্রশংসাকারীদের সংখ্যাও অনেক। আর তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-পোষণকারী ও তাঁর সমালোচনাকারীরাও তাঁকে ছেড়ে কথা বলেননি এবং তাঁর ভাল দিকগুলিকে খারাপে পরিবর্তিত করে দিতে এক মিনিটও দেরী করেননি। সুনানে আরবা'আর ভাগ : ছহীহ আবূদাঊদ, ছহীহ তিরমিযী, ছহীহ নাসাঈ, ছহীহ ইবনু মাজাহ এবং যঈফ আবূদাঊদ, যঈফ তিরমিযী, যঈফ নাসাঈ, যঈফ ইবনু মাজাহ; অনুরূপভাবে ছহীহ আদাবুল মুফরাদ, যঈফ আদাবুল মুফরাদ, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ছহীহুল জামে', যঈফুল জামে' ঐ সকল আলেমদের দৃষ্টিতে মোটেও সহ্য হয় না।

তাঁর সমালোচকদের মধ্যে শু'আইব আরনাঊত্বও রয়েছেন, যিনি আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলেম ও মুহাক্কিক্ব। বরং শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর সাথে তাঁর বংশগত সম্পর্কও রয়েছে। শায়খ শু'আইবের যোগ্য ছাত্র ইবরাহীম যীবাক্ব তাঁর জীবনী ও ইলমী খেদমত সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেটি الحدث العلامة الشيخ شعيب الارناؤط : سيرته في طلب العلم وجهوده في تحقيق التراث নামে বৈরূতের দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত হয়ে আগ্রহীদের হাতে হাতে ঘুরছে। এই বইয়ের একটি অংশে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর তাহক্বীক্বসমূহ সম্পর্কে কিছু সমালোচনামূলক কথা রয়েছে। গ্রন্থটির সেই অংশটির উর্দূ অনুবাদ করাচীর 'মাসিক বাইয়েনাত' পত্রিকার ৭৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় *(শা'বান ১৪৩৫ হিঃ/জুলাই ২০১৫)* প্রকাশিত হয়েছে। যেটি জামে'আতুল উলূম আল-ইসলামিয়াহ, বিন্নুরী টাউন-এর মুখপত্র।

শায়খ শু'আইব মনখুলে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন এবং হাদীছ বিষয়ে তাঁর খেদমতের প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'এই সত্য প্রকাশে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) একইসাথে তাঁর পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে হাদীছ অধ্যয়ন ও সূক্ষ্মভাবে তা তাহক্বীক্ব করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করার মর্যাদা হাছিল করেছেন। বলা যেতে পারে যে, (নিকট অতীতে) তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মিসর ও সিরিয়ায় পুনরায় হাদীছ গবেষণা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই কাজের জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।[১]

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩০,৩১।*

Contents

উপরন্তু তিনি বলেছেন, 'শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রিয় বিষয় হ'ল ইলমে হাদীছ। এই ইলম চর্চা ও গবেষণায় শায়খ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়, প্রায় ষাট বছর ব্যয় করেছেন। অবশ্য শায়খ এই শাস্ত্রে অন্যান্য মুহাদ্দিছদের ন্যায় মর্যাদা অর্জন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর থেকে ভুল ও সঠিক উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে'।[২]

তিনি একেবারেই সত্য বলেছেন। বড় বড় আলেমের বক্তব্যে ভুল ও শুদ্ধতার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার বিষয় হৌক বা কোন ফিক্বহী মাসআলা হৌক; এতে কারোই সকল অভিমত সঠিক হয় না। বরং ভুল-ভ্রান্তির বিপদ ও আশঙ্কা থাকে এবং বাস্তবে তা হয়েও থাকে। ইমাম মালেক (রহঃ) এজন্যই বলেছেন, كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، وَيُتْرَكُ إِلاَّ صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'প্রত্যেকের উক্তি গ্রহণ করা যায়, আবার বর্জনও করা যায়। কিন্তু এই কবরবাসী অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত'।[৩]

আল্লামা আলবানী (রহঃ)ও মানুষ। তাঁরও ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। স্বয়ং এই অধমও তাঁর কতিপয় ফায়ছালার সাথে একমত নন। কিন্তু শায়খ শু'আইবও তাঁর যে সকল ভুলচুক উল্লেখ করেছেন এবং কতিপয় বিষয় তাঁর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন, সেগুলির সাথেও ঐক্যমত পোষণ করা মুশকিল। আমরা এখানে এ সম্পর্কে কতিপয় অভিযোগ সম্মানিত পাঠকদের খেদমতে পেশ করতে চাই।

এক আশ্চর্য মতামত :

শায়খ শু'আইব বলেছেন, 'তিনি তাঁর তাহক্বীক্বের আলোকে ছহীহ আখ্যাদানকৃত হাদীছসমূহ ও সুন্নাতের দিকে দাওয়াত দিতেন। তাঁর আকাংখা ছিল যে, তাঁর তাছহীহ অনুসরণীয় ইমামদের ইজতিহাদের সমপর্যায়ের মর্যাদা লাভ করুক এবং বিতর্কিত মাসআলাগুলিতে তাঁর রায়-কেই চূড়ান্ত ফায়ছালা আখ্যা দেয়া হোক'।[৪]

কিন্তু এই বক্তব্য আন্দাযে ঢিল ছোঁড়া ও দলীলবিহীন দাবীর নামান্তর। আল্লামা আলবানীর মানহাজ হ'ল التمسك بالسنة الصحيحة (ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা)। আজীবন তিনি এরই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। স্বীয় মত-কে 'অকাট্য ফায়ছালা' হিসাবে গ্রহণ করার দাওয়াত তিনি কখনো দেননি। তাঁর বক্তব্য ও দাওয়াত ছহীহ হাদীছের উপর আমল ছিল। আর ছহীহ হাদীছ-ই তাঁর নিকটে 'অকাট্য ফায়ছালা' ছিল। হাদীছের বিশুদ্ধতা বা তার উপর আমল করা হোক সবদিক থেকে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন, যেখানে কোন হাদীছকে মুহাদ্দিছ ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে যঈফ বলেছেন আর আল্লামা আলবানী তাকে ছহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে এমন কোন হাদীছ নেই যার উপর আমল সর্বসম্মতভাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে, অথচ আল্লামা আলবানী (রহঃ) তাঁর উপর আমল করার দাওয়াত দিয়েছেন। বরং আমরা দেখি যে, সফর হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত পড়ার হাদীছটি কর্ম ও বাণী উভয়ভাবেই ছহীহ। আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেছেন, وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه . والله أعلم 'বাহ্যিক হুকুম দ্বারা মুসাফিরের প্রত্যাবর্তনের পরে মসজিদে ছালাতের ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমি অবগত নই যে, আলেমদের মধ্য হ'তে কোন আলেম একে ওয়াজিব বলেছেন। যদি এটা জানা যায় তবে ওয়াজিব হওয়ার মতটি গ্রহণ করব। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'।[৫]

বরং শায়খ আলবানী স্বীয় ছাত্রদেরকে বলতেন, اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام 'এমন মাসআলায় কথা বলা থেকে বিরত থাক, যেখানে তোমার কোন ইমাম নেই'।[৬]

মতনের সমালোচনার প্রতি দৃকপাত না করা :

শায়খ শু'আইব এই শিরোনামের অধীনে এটাও বলেছেন, 'শায়খ আলবানী ইলমে মুছত্বালাহুল হাদীছে অবশ্যই পড়ে থাকবেন যে, ছহীহ হাদীছ তাকে বলে যার সনদ (অধস্তন) রাবী থেকে নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত মুত্তাছিল (সংযুক্ত) হবে এবং সেই বর্ণনাটি ইল্লাত[৭] বা শুযূয হ'তে মুক্ত থাকবে। কিন্তু আফসোস এই যে, হাদীছের উপরে হুকুম লাগানো প্রসঙ্গে না তিনি শুযূয[৮] ও ইল্লাতের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন আর না হাদীছের মতনের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন'।[৯]

প্রথম কথাটির ন্যায় এ কথাটিও সঠিক নয়। تمام المنة في التعليق على فقه السنة-এর ভূমিকায় যে মূলনীতিসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি এটাই রয়েছে যে, رد الحديث الشاذ (শায হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা)। যার অধীনে তিনি ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)-এর 'মুক্বাদ্দামা' ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর 'শরহে নুখবা'র উদ্ধৃতিতে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত হ'ল, তা শায ও মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হবে না।

---

২. *ঐ, পৃঃ ৩১, ৩২।*
৩. *আস-সিয়ার ৮/৯৩।*
৪. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩১।*
৫. *আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ২/৬২৮।*
৬. *জুহূদুল ইমাম আলবানী ৩/২৪৩।*
৭. *ইল্লাত বলা হয় এমন গোপন ত্রুটিকে যা হাদীছকে দুর্বল করে দেয়। যা বাহ্যিকভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। বরং লুক্কায়িত থাকে। দক্ষ মুহাক্কিক্ব ব্যতীত যা অন্যরা বুঝতে সক্ষম নন। যে হাদীছের মধ্যে ইল্লাত (ত্রুটি) বিদ্যমান তাকে 'মুআল্লাল' (ত্রুটিযুক্ত) বলা হয়।-অনুবাদক।*
৮. *শায-এর বহুবচন হ'ল শুযূয। শায-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল- জমহূর তথা অধিকাংশের বিরোধী হওয়া। পরিভাষায়- কম আস্থাভাজন রাবী যদি তার চাইতে বেশী আস্থাভাজন রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন তবে তুলনামূলক কম আস্থাভজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিকে শায বলা হয়।-অনুবাদক।*
৯. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৩।*

আমরা এখানে সেই ইবারতগুলির অনুবাদ উল্লেখ করে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আলেম ও হাদীছের ছাত্ররা স্বচক্ষে অত্র ইবারতগুলি 'মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ' ও 'শরহে নুখবা' এবং 'তামামুল মিন্নাহ' গ্রন্থের ভূমিকাতেও *(পৃঃ ১৫, ১৬)* দেখতে পারেন। এত পরিস্কার ও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট বাস্তবতার বিপরীতে শায়খ শু'আইবের এ কথা বলা যে, 'হাদীছের উপর হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে আল্লামা আলবানী শুযূয ও ইল্লাতের প্রতি গুরুত্ব দেননি'- একেবারেই বাস্তবতা বিবর্জিত। এর চেয়ে আরো বেশী কিছু উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। তবে আগ্রহী পাঠকগণ 'শায'-কে খণ্ডন করার উদাহরণ 'যঈফা' *(১০/৭৫৮)* গ্রন্থে দেখতে পারেন।

হাদীছের তাছহীহ[১০] ও তাযঈফের[১১] ব্যাপারে এই কথাটিও লক্ষণীয় যে, শায়খ আলবানী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যখন আমাদের সামনে একজন রাবী ছিক্বাহ হবে এবং কোন ইল্লাতও জানা যাবে না, কিন্তু কোন ইমাম বা অধিকাংশ হাদীছের সমালোচক সেটাকে মুনকার বলেছেন; তাহ'লে কি বাহ্যিকভাবে সনদের বিরোধী এই হুকুম গ্রহণ করা যাবে? এর জবাবে তিনি বলেছেন, الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين إلا إذا ترجح أمران اثنان 'মূলনীতি এটাই যে, পূর্ববর্তী ইমামদের কথাকে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা দু'টি বিষয়কেই প্রাধান্য দিতে হবে'।

আপনারা চিন্তা করুন যে, আল্লামা আলবানীর নিকটে পূর্ববর্তী ইমামদের উক্তি কতটুকু গুরুত্ববহ ছিল। উক্ত প্রশ্নের জবাবে পরিশেষে তিনি বলেছেন, إذا كان هناك حديث اسناده صحيح لا نقول مقتصرين فقط علي ان رجاله ثقات، لانه لا بد عن تأمل لا بد عن التدقيق فيه، لعل في هذا الإسناد علة، فاذا ما اجتهد مجتهد فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينئذ يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقي امامه فيما يعكر علي هذا التصحيح إلا قول ذاك الامام، حينئذ ينظر في قوله، فان بدا وجه اتبعه، وإلا ظل علي التصحيح هذا الذي يبدو لي في هذا الموضوع، وهذا الذي نجري عليه في كثير من الأحاديث– 'যখন কোন হাদীছের সনদ ছহীহ হবে, তখন আমরা স্রেফ তার বর্ণনারীদের ছিক্বাহ হওয়ার কারণে সেটাকে (ছহীহ) বলব না। কারণ এতে চিন্তা ও সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে যে, হয়ত এই সনদের কোথাও কোন ত্রুটি থাকতে পারে। যদি কোন প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা করার পর তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এতে মারাত্মক ত্রুটি নেই, তখন তার জন্য এ কথা বলা সঠিক হবে যে, এর সনদ ছহীহ। এই তাছহীহ-এর পর তার সামনে তার বিরোধী সেই ইমামের উক্তি থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার বক্তব্যের ব্যাপারে ভাবতে হবে। যদি তার কোন কারণ প্রতীয়মান হয় তাহ'লে সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করা যাবে। নতুবা তাছহীহ-এর উপর ক্বায়েম থাকবে। এ বিষয়ে এটাই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। আর অধিকাংশ হাদীছ সম্পর্কে আমাদের কর্মপন্থা এটাই'।[১২]

শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর এই সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারাও হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য 'শায ও 'ইল্লাত' না থাকার শর্তের ব্যাপারে কোন অসঙ্গতি থাকে না। এজন্য শায়খ শু'আইব তাঁর দিকে যে কথার সম্বন্ধ করেছেন, তা তাঁর ব্যাখ্যার একেবারেই উল্টো।

শায়খ শু'আইব এটাও অভিযোগ করেছেন যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) হাদীছের সমালোচনার ক্ষেত্রে হাদীছের মতনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন না। তিনি এমন অসংখ্য হাদীছকে ছহীহ বলেছেন যেগুলির মতনের ব্যাপারে আলেমগণ সমালোচনা করেছেন।[১৩]

ঐগুলি কোন হাদীছ? এ ব্যাপারে তিনি মিশকাতুল মাছাবীহ *(হা/১১২)* ও ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর *(হা/৭১৪২)* হ'তে বর্ণনা করেছেন। যার শব্দগুলি হ'ল- الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ 'সন্তানকে জীবিত দাফনকারী মহিলা ও প্রোথিত কন্যা উভয়েই জাহান্নামে যাবে'।

বলা হয়েছে যে, এই হাদীছটি কুরআনের আয়াত وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 'যেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকবীর ৮১/৮)*-এর স্পষ্ট বিরোধী। যদিও শায়খ এর অপসন্দনীয় তাবীল করতে চেষ্টা করেছেন।[১৪]

নিবেদন হ'ল, প্রথমে এটা দেখুন যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) কি উক্ত হাদীছটিকে একাই ছহীহ বলেছেন? এই হাদীছটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে আবূদাঊদ *(হা/৪৭১৭)*, ছহীহ ইবনু হিব্বান *(হা/৭৪৩৭)*, ত্বাবারানী ও ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর 'আছ-ছহীহ'[১৫] গ্রন্থে উল্লেখ করা এর দলীল যে, এই হাদীছটি তাঁর নিকটে ছহীহ। ইমাম আবূদাঊদ ও আল্লামা মুনযিরী (রহঃ) এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। আল্লামা আযীযীও বলেছেন, إسناده صحيح 'এর সনদ ছহীহ'।[১৬] আল্লামা সুয়ূত্বী 'আল-জামেউছ ছগীর' গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। আল্লামা মুনাবী 'ফায়যুল ক্বাদীর' *(৬/৩৭১)* গ্রন্থে বলেছেন, رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى 'লেখক অর্থাৎ আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) হাদীছ হাসান

১০. *হাদীছকে ছহীহ হিসাবে আখ্যায়িত করাকে তাছহীহ বলা হয়।-অনুবাদক।*
১১. *হাদীছকে যঈফ হিসাবে আখ্যা দেওয়াকে তাযঈফ বলা হয়।-অনুবাদক।*
১২. *সুওয়ালাত লিল-আল্লামা আলবানী সাআলাহা আবূ আব্দুল্লাহ আল-আয়নাইন, পৃঃ১৫১।*
১৩. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩২।*
১৪. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩২।*
১৫. *এই গ্রন্থটি ছহীহ ইবনু হিব্বান নামে প্রসিদ্ধ। এতে ৭৪৯১টি হাদীছ রয়েছে।-অনুবাদক।*
১৬. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/২০০।*

হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন। তিনি যেমনটি বলেছেন ব্যাপারটা তাই বা তার চাইতে উঁচু স্তরের'।

পক্ষান্তরে 'আত-তায়সীর বি-শারহিল জামি আছ-ছগীর' গ্রন্থে আল্লামা মুনাবী (রহঃ) বলেছেন, واسناده صَحِيح فرمز الْمُؤلف لحسنه تَقْصِير 'এর সনদ ছহীহ। আর লেখকের হাসান হওয়ার আলামত লাগানো ত্রুটিযুক্ত' *(২/৮৫)*।

উপরন্তু এই বর্ণনাটি মাসলামা বিন ইয়াযীদ জু'ফী (রাঃ) থেকে মুসনাদে আহমাদ *(৩/৪৭৮)*, নাসাঈর আস-সুনানুল কুবরা *(হা/১১৬৪৯)*, ত্বাবারানী *(হা/৬৩১৯)* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেছেন যে, لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث إِسْنَادٌ أَقْوَى وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِسْنَاد 'এই সনদের চেয়ে এ হাদীছের অধিক উত্তম ও অধিক শক্তিশালী সনদ আর নেই'।[১৭]

আল্লামা হায়ছামী এ সম্পর্কে বলেছেন, رجاله رجال الصحيح 'এর রাবীগণ ছহীহ গ্রন্থের রাবী'।[১৮]

বরং স্বয়ং শায়খ শু'আইবও মুসনাদে আহমাদ-এর তাহক্বীক্বে বলেছেন যে, 'এই হাদীছের রাবী ছিক্বাহ (বিশ্বস্ত) ও শায়খায়নের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের) রাবী, দাঊদ বিন আবী হিন্দ ব্যতীত। তিনি শুধু ছহীহ মুসলিমের রাবী।[১৯]

এ আলোচনার মাধ্যমে এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সনদের দিক থেকে এই বর্ণনাটি ছহীহ। আর আল্লামা আলবানী একাই একে ছহীহ বলেননি। অবশ্য শায়খ শু'আইব হাদীছের মতনের মধ্যে নাকারাত[২০] অবগত হয়েছেন। কারণ যেসব হাদীছে জীবন্ত দাফনকৃত কন্যার জান্নাতী হওয়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি এর বিপরীত। আর এই হাদীছটি কুরআনের আয়াত وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ এরও বিরোধী। মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীক্বে এজন্য হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের طريق الهجرتين وباب السعادتين গ্রন্থটি অধ্যয়ন করার প্রতিও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এই অভিযোগটি মূলতঃ হানাফী মূলনীতির আলোকে করা হয়েছে যে, দু'টি পরস্পর বিরোধী বর্ণনার মধ্যে প্রথমত: এই শর্তে রহিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি পূর্বের ও কোন্‌টি পরের তা প্রতীয়মান হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত: তারজীহ[২১] দেওয়া। যদি দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে তারজীহ দেওয়ার কোন পথ না থাকে তবে তৃতীয়ত: উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা হবে। যদি সমতা বিধানেরও কোন পথ না থাকে তবে চতুর্থত: উভয়ের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। শায়খ শু'আইব এখানেও দু'টি বর্ণনার মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্যের ভিত্তিতে তারজীহ-কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রোথিত কন্যার জান্নাতী হওয়ার বর্ণনাগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কিন্তু এটি মুহাদ্দিছীনে কেরামের মূলনীতি নয়। তাঁরা প্রথমে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে উভয়টির মধ্যে শেষ বর্ণনা কোনটি তা জানা গেলে সর্বশেষ বর্ণনাটিকে নাসেখ (রহিতকারী) আখ্যা দেন। আর যদি এটাও জানা না যায় তবে তৃতীয় অবস্থা 'রাজেহ' ও 'মারজূহ' (অবশিষ্ট) থাকে। যদি তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়ারও কোন পথ না থাকে তবে সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) শরহে নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থে *(পৃঃ ৫৮, ৫৯)* স্পষ্টভাবে বলেছেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) মুহাদ্দিছীনে কেরামের অবস্থানেরই যিম্মাদার। তিনি প্রথমত: দু'টি ছহীহ হাদীছের মধ্যে সমতা বিধানেরই প্রবক্তা। তার বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ- لا يجوز رد الحديث الصحيح بمعارضته لما هو أصح منه، بل يجب الجمع والتوفيق بينهما 'ছহীহ হাদীছকে তার চাইতে অধিক বিশুদ্ধ হাদীছের সাথে পরস্পর বিরোধী হওয়ার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা জায়েয নয়। বরং উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা যরূরী'।[২২]

এই মূলনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লামা আলবানী (রহঃ) উভয় হাদীছ-যেগুলিকে পরস্পর সাংঘর্ষিক বলা হচ্ছে-এর মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন,

ثم إن ظاهر الحديث ان الْمَوْءُودَةَ في النار ولو لم تكن بالغة، وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة أنه لا تكليف قبل البلوغ وقد أجيبت عن هذا الحديث بأجوبة اقربها عندي الي الصواب ان الحديث خاص بمَوْءُودَة معينة، وحينئذ ال' في الْمَوْءُودَة ليست لاستغراق بل للعهد، ويؤيده قصة ابني مليكة، وعليه فجائز ان تلك الْمَوْءُودَة كانت بالغة فلا إشكال، والله اعلم.

'এই হাদীছটির বাহ্যিক দাবী এই যে, প্রোথিত কন্যা জাহান্নামে যাবে। যদিও সে বালেগা না হয়। কিন্তু এই বাহ্যিক মর্ম শরী'আতের দলীল বিরোধী যে, বালেগা হওয়ার পূর্বে কেউ শরী'আতের বিধান মানতে আদিষ্ট নয়। আর এই হাদীছটির বিভিন্ন জবাব প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে আমার নিকটে সর্বাধিক বিশুদ্ধ জবাব হ'ল এই হাদীছটি একজন নির্দিষ্ট প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে প্রযোজ্য। আর তখন الْمَوْءُودَة এর মধ্যে ال ইসতিগরাক্ব (সমষ্টিবাচক)-এর জন্য নয়। বরং

---

১৭. *আত-তামহীদ ১৮/১২০।*
১৮. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১১৯।*
১৯. *মুসনাদে আহমাদ ২৫/২৬৮।*
২০. *যঈফ হাদীছ ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধে যাওয়াকে নাকারাত বলা হয়। সেক্ষেত্রে যঈফ হাদীছটিকে 'মুনকার' ও ছহীহ হাদীছটিকে 'মারূফ' বলা হয়।-অনুবাদক*
২১. *তারজীহ অর্থাৎ অগ্রাধিকার দেওয়া। যখন দু'টি গ্রহণযোগ্য হাদীছ পরস্পর বিরোধী অবস্থানে থাকে তখন উভয়ের মধ্য হতে কোন একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করাকে 'তারজীহ' বলা হয়। যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে 'রাজেহ'। আর যার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাকে 'মারজূহ' বলা হয়।-অনুবাদক।*
২২. *ছহীহা হা/৪৬০।*

আহদে যিহনীর (নির্ধারিত একজনের) জন্য। মুলায়কার পুত্রদের ঘটনার হাদীছটি দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায় (যা সালামাহ বিন ইয়াযীদ জু'ফী হ'তে বর্ণিত)। এজন্য এ কথা বলা সিদ্ধ যে, সেই প্রোথিত কন্যাটি বালেগা তথা প্রাপ্তবয়স্কা ছিল। আর এভাবেই এই হাদীছটির উপর উত্থাপিত অভিযোগ দূরীভূত হয়ে যায়। *আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'।*[২৩]

শায়খ শু'আইব আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর এই সমন্বয় সাধনের সাথে একমত নন। তিনি একে 'অপসন্দনীয় তাবীল' আখ্যা দিয়েছেন। আমরা আরয করেছি যে, শায়খ শু'আইব 'তারজীহ'-এর মূলনীতি জানার কারণে এসব কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিছ আলবানী (রহঃ) মুহাদ্দিছদের পন্থায় সমতা বিধানের চেষ্টা করেছেন। শায়খ শু'আইব যদি এই সমতা বিধানের সাথে একমত না হন, তাহ'লে এর পরিবর্তে হাদীছের ব্যাখ্যাকারগণ এর আরো অনেকগুলি ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেছেন। যেমন একটি ব্যাখ্যা এই যে, وائدة দ্বারা دائيه উদ্দেশ্য; যে দাফনকারী। আর اَلْمَوْءُودَة দ্বারা অর্থাৎ তার মা উদ্দেশ্য। আর اَلْمَوْءُودَة لها -এর উহ্য ছেলাহ।

আরো একটি ব্যাখ্যা এটাও রয়েছে যে, اَلْمَوْءُودَة দ্বারা নির্দিষ্ট দাফনকৃত কন্যা উদ্দেশ্য। সে বালেগা হোক বা নাবালেগা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহীর মাধ্যমে তার সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়ছালা ও তাক্বদীরের সংবাদ দিয়েছেন। আর اَلْمَوْءُودَة-এর اَلْ সমষ্টিবাচকের জন্য নয়। (বরং) নির্দিষ্ট দাফনকৃত কন্যা সম্পর্কে। এই ব্যাখ্যাগুলির বিস্তারিত আলোচনা মিরক্বাত *(১/১৮২, ১৮৩)*, মির'আতুল মাফাতীহ *(১/২০০)*, 'আওনুল মা'বূদ *(৪/৩৬৬)*, ছান'আনীর আত-তানবীর শরহে জামে ছগীর *(১১/১১০)*, ফায়যুল ক্বাদীর *(৬/৩৭১)*, শরহে ত্বীবী *(১/২৬৩, ২৬৪)*, ইবনুল মালেক রূমীর শরহে মাছাবীহুস সুন্নাহ *(১/১২৯)*, বায়যাবীর তুহফাতুল আবরার শরহে মাছাবীহুস সুন্নাহ *(১/১১০)*, আল-মাফাতীহ ফী শরহে মাছাবীহ *(১/২১৮)*, লুম'আতুত তানক্বীহ *(১/১৭৯)*, আশি'আতুল লুম'আত *(১/১০৬)* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে।

এর দ্বারা এ কথাটিও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এ সকল আলেমগণও اَلْمَوْءُودَة-এর সাথে সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির ক্ষেত্রে জমাকরণ ও সমন্বয় সাধনের পন্থাটি-ই অবলম্বন করেছেন। আর এই অবস্থানটিই আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর। এ ক্ষেত্রেও তিনি একক নন। যেমনটি শায়খ শু'আইবের উক্তি দ্বারা বুঝা যায়।

আমরা তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ইবনুল ক্বাইয়িমের طريق الهجرتين গ্রন্থটিও দেখেছি, যেখানে তিনি মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে আটটি মাসলাক উল্লেখ করেছেন। যেখানে শায়খ শু'আইবের অবস্থানের বিপরীতে তিনি এই মাসলাক ও অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, ক্বিয়ামতের দিনে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। বরং اَلْمَوْءُودَة (জীবন্ত দাফনকৃত কন্যা) এবং যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তাদের সকলের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হবে। যে তাঁর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে নাফারমানী করবে সে জাহান্নামে যাবে। তিনি আরো বলেছেন, وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث 'এভাবে সকল দলীল পরস্পর মিলে যায় এবং হাদীছগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় যায়' *(পৃঃ ৫২১)*।

নিন জনাব! শায়খ শু'আইব প্রদত্ত পরামর্শের ফলাফলের ভিতরেও সমতা বিধানের ছুরত বের হ'ল। ত্বরীকুল হিজরাতায়ন গ্রন্থটি-ই নয়, তাহযীবুস সুনান গ্রন্থেও *(৭/৮৭)* হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এই অবস্থাকে সঠিক ও 'সর্বাধিক ন্যায়সংগত মতামত' আখ্যা দিয়েছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছকে সকল প্রোথিতকারী কন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গণ্য করেননি। তিনি স্বীয় পসন্দকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, هى فى النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار 'জীবিত প্রোথিত কন্যা জাহান্নামে যাবে। যতক্ষণ না তার জাহান্নামে যেতে বারণকারী কোন কারণ পাওয়া যাবে'।[২৪]

আর আখেরাতে তার পরীক্ষা নেওয়াটাই হ'ল সেই কারণ। উপরন্তু তিনি বলেছেন, 'যখন জীবিত প্রোথিতকারীকে প্রশ্ন করা হবে যে, কোন্ অধিকারে তুমি এরূপ করেছ? তাকে এই পাপের কারণে আযাব দেয়া হবে। তাহ'লে প্রোথিতকে গুনাহ ব্যতীত কেন আযাব দেওয়া হবে? তার গুনাহ তার পরীক্ষায় রাসূলের নাফরমানীর ফলস্বরূপ হবে'।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম-ই নন; বরং হাফেয ইবনু হাজারও এটাই বলেছেন যে, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। যেমনভাবে ছহীহ হাদীছসমূহে পাগল ও নবী আসার বিরতিকালীন সময়ে মৃত্যুবরণকারীদের সম্পর্কে পরীক্ষা করার কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, انه المذهب الصحيح 'এটাই ছহীহ মাযহাব'।

আল্লামা নববী (রহঃ)ও বলেছেন যে, 'এটাই ছহীহ মত। মুহাক্কিক্ব আলেমগণ এই মতই গ্রহণ করেছেন'।[২৫]

আমাদের এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাক্কিক্ব আলেমগণও এই হাদীছগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন। আর এটা শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর অবস্থান। যদিও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং শায়খ শু'আইব যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা মুহাদ্দিছদের মূলনীতি মোতাবেক নয়। আর তিনি শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর উপর যে অপবাদ আরোপ করেছেন সেটাও নিশ্চিতরূপে সঠিক নয়।

(চলবে)

---

২৩. *হাশিয়াতুল মিশকাত নং ৪০*

২৪. *তরীকুল হিজরাতইন, পৃঃ ৫১৯।*

২৫. *ফাৎহুল বারী, ৩/২৪৬, ২৪৭।*

Contents

ধ্বংসলীলা

*রফীক আহমাদ**

আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু সমূহ প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত (১) দৃশ্যমান ও (২) অদৃশ্য। দৃশ্যমান বস্তু সমূহের মধ্যে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকা প্রভৃতি। ক্ষুদ্র বস্তু সমূহের মধ্যে মানুষ, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদরাজি, জলজপ্রাণী সমূহ প্রভৃতি। অদৃশ্য বস্তু সমূহের মধ্যে আছে হাওয়া-বাতাস, প্রাণীর জীবন-মৃত্যু, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আরও কত যে জানা-অজানা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তু সমূহ রয়েছে, যার কোন ইয়ত্তা নেই।

ধ্বংস বা ধ্বংসলীলা একটি মারাত্মক আকস্মিক অদৃশ্য শক্তি। এ শক্তির আক্রমণ সময় বা বাস্তবায়ন সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। তবে এর গতি প্রকৃতি ও আগমনের নমুনা সম্বন্ধে সামান্য অবগত। যেমন ভূমিকম্প, সুনামি, সিডর, আইলা, হ্যারিকেন, ঝড়-বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো প্রভৃতির আক্রমণ কখনো কখনো ব্যাপক ধ্বংস বয়ে আনে। আবার আকস্মিকভাবে মারাত্মক দুর্ঘটনায় আকাশ পথে মাঝে মধ্যে ধ্বংস হয় অনেক যাত্রীবাহী বিমান। সড়ক পথেও যানবাহনে দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। পানিপথেও নৌযানগুলোর মধ্যে অনুরূপ দুর্ঘটনার অন্ত নেই।

সুতরাং ধ্বংস বা ধ্বংসলীলা হ'ল একটি লোমহর্ষক বিষয়, যা সমস্ত সৃষ্টির জন্য হুমকী স্বরূপ। এ ধ্বংসলীলায় শুধু মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, বরং জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী এবং বাড়ী-ঘর বা বাসস্থান সবই ধ্বংস হয়, পাশাপাশি ফলজ ও বনজ উদ্ভিদরাজিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এসব ধ্বংসযজ্ঞ সাধারণত কোন অঞ্চল বা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখন জানার বিষয় হ'ল, এসব ধ্বংসলীলার কারণ কী? এগুলো কেন হয়? কখন হয়? মহান আল্লাহই তো সব কিছুর স্রষ্টা। পবিত্র কুরআনে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'তারা (ঈমান আনার) কল্যাণের পূর্বেই তোমার কাছে শাস্তি ত্বরান্বিত করার দাবী জানায়। অথচ তাদের পূর্বে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তোমার পালনকর্তা তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর' *(রা'দ ১৩/৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'আর আল্লাহ্র জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী' *(আলে ইমরান ৩/১৮৯)*। তিনি আরো বলেন, فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ 'আমি তো প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি' *(ক্বামার ৫৪/৫৯)*।

তাঁর মহাশক্তির বহিঃপ্রকাশ হ'ল, فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ 'তিনি যা চান, তাই করেন' *(বুরূজ ৮৫/১৬)*।

মানুষের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে, পরকালকে বিশ্বাস করে, আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করে, তাঁর পুরস্কার ও শাস্তিকে বিশ্বাস করে এবং তাঁকে সর্বদা ভয় করে চলে। অপরদিকে কোন কোন সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, পরকালে বিশ্বাস করে না, তাঁর আদেশ-নিষেধও পালন করে না, বরং বিরোধিতা করে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের প্রতি আল্লাহ চরম অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর নবী-রাসূলদের দ্বারা সতর্কবাণী ও শাস্তির বর্ণনা পেশ করেন। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ঐসব লোকেরা মোটেও ভীতু না হয়ে বরং তারা তাদের নবীকেই নানারূপ ভয়-ভীতি এমনকি হত্যারও হুমকী দিত। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয়াবহ আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেন।

আসলে ধ্বংস বা ধ্বংসলীলা আল্লাহ্র সৃষ্ট একটি অবর্ণনীয় অলৌকিক শক্তি। শুধু মানব জাতির অহংকার চূর্ণ করার জন্য, আল্লাহ্র মহাজ্ঞানের নিদর্শনকে অবজ্ঞা করার জন্য, ধ্বংসের মত অকল্পনীয় বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধ্বংসের প্রণালী কত প্রকারের হ'তে পারে তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তবে প্রাচীনকালের ঘটনাপ্রবাহ হ'তে ধ্বংসের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে তুলে ধরা হ'ল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে প্রত্যাদেশ হয়েছে, بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ 'এ এক ঘোষণা সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে ধ্বংস করা হবে না' *(আহকাফ ৪৬/৩৫)*। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ، ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِيْنَ– 'বস্তুতঃ আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি, যেখানে সতর্ককারী ছিল না- স্মরণ করানোর জন্য। আর আমরা যালেম নই' *(শু'আরা ২৬/২০৮-৯)*। অতঃপর আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِيْنَ– 'আমরা কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি? অতঃপর আমরা তাদের অনুগামী করব পরবর্তীদের। অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপ আচরণই করে থাকি' *(মুরসালাত ৭৭/১৬-১৮)*।

মূলতঃ ধ্বংস বা ধ্বংসলীলা মানবজাতির সীমাহীন কুকর্মের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির ইতিহাসে প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় অন্যায়, অপরাধ ও সীমালংঘনে জড়িয়ে পড়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُوْلَى، وَثَمُوْدَ فَمَا أَبْقَى، وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى 'তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন এবং ছামূদকেও, অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেননি এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও যালেম ও অবাধ্য' *(নাজম ৫৩/৫০-৫২)*। সুতরাং নূহের

**শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

সম্প্রদায়ই আগে ধ্বংস হয়েছিল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল, এতো উন্মাদ! তারা তাঁকে হুমকী প্রদর্শন করেছিল। অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল, আমি অক্ষম। অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন। তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণের মাধ্যমে এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবন। অতঃপর সব পানি মিলিত হ'ল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে, যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ ছিল, যাঁকে প্রত্যাখান করা হয়েছিল' *(কামার ৫৪/৯-১৪)*।

এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন, 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা সেখানকার সমৃদ্ধশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে তার উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা ওটাকে বিধ্বস্ত করে দেই। আর নূহের পরের যুগ সমূহে আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি। বস্তুতঃ তোমার পালনকর্তাই তার বান্দাদের পাপাচার সমূহের খবর জানা ও দেখার জন্য যথেষ্ট' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৬-১৭)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'স্ব স্ব পাপের কারণে তাদের প্রত্যেককে আমরা পাকড়াও করেছি। তাদের কারু প্রতি আমরা ছোট পাথরসহ প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছি (যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর) কাউকে পাকড়াও করেছে প্রচণ্ড নিনাদ বজ্রপাত (যেমন ছালেহ ও শু'আইবের সম্প্রদায়)। কাউকে ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে (যেমন কারূণকে)। কাউকে আমরা ডুবিয়ে মেরেছি (যেমন নূহ ও ফেরাঊনের সম্প্রদায়কে)। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করতে চাননি (কেননা তাদের নিকট তিনি আগেই নবী পাঠিয়েছিলেন)। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' *(আনকাবূত ২৯/৪০)*। আল্লাহদ্রোহী ও নির্ভীক সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি সীমাহীন। অনুরূপ এক সম্প্রদায়ের শাস্তির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى 'তিনিই (লূত সম্প্রদায়ের) এক বাসভূমি শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন' *(নাজম ৫৩/৫৩)*।

বস্তুতঃ ধ্বংস ধ্বংসই, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধ্বংসের তাণ্ডব অনেক কমবেশী মনে হ'লেও সব ধ্বংসের মধ্যেই নিদারুণ যন্ত্রণা রয়েছে। তাছাড়া পরাক্রমশালী আল্লাহ ধ্বংসলীলার মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। আসলে উম্মতে মুহাম্মাদীর তথা আমাদের প্রকৃত উপকারার্থেই আল্লাহ তা'আলা সুদূর অতীতের বাস্তব ঘটনাবলীর কিয়দাংশ কুরআনে উপস্থাপন করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করত আর বলত, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে? ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের চেয়েও শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নির্দেশগুলোকে অস্বীকার করত। তারপর আমি ওদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর শাস্তি ভোগ করানোর জন্য দুর্ভোগের দিনে ওদের বিরুদ্ধে ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম। পরকালের শাস্তি তো আরও অপমানকর, আর ওদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/১৩-১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো 'আদের ভাই হূদের কথা, যার আগে ও পরে সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে (ইয়েমেনের আহকাফ মালভূমির বাসিন্দারা) এ বলে সতর্ক করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে নিবৃত্ত করতে আমাদের নিকটে এসেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহ'লে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। সে বলল, এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তা-ই তোমাদের কাছে প্রচার করি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মুর্খ সম্প্রদায়। অতঃপর যখন তারা দেখল উপত্যকার নিকটে মেঘমালা দেখল তখন ওরা বলতে লাগল, এ মেঘমালা আমাদের বৃষ্টি দিবে। না, বরং এটি তা-ই যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ এক ঝড়, যাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দিবে।

ফলে তাদের পরিণাম এমন হ'ল যে, ওদের বসতগুলো ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি' *(আহকাফ ৪৬/২১-২৬)*। 'আর নিদর্শন রয়েছে তাদের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক বিধ্বংসী ঝড়, তা যার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তা-ই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল' *(যারিয়াত ৫১/৪১-৪২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় ক্বিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল। অতঃপর ছামূদ, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল গগণবিদারী এক নিনাদ দ্বারা। আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড এক ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপরে সাত রাত্রি ও আট দিবসব্যাপী অবিরামভাবে। তুমি (সেখানে থাকলে) তাদের দেখতে জীর্ণ খেজুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে পড়ে আছে। তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও কি? *(হাক্কা ৬৯/৪-৮)*।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। নিকৃষ্টতম শয়তানের উদ্ভব হয় মানুষকে পরীক্ষার জন্য। শয়তান আল্লাহ্র নিকট কিছু ক্ষমতা প্রার্থনা করে নেয়, যাতে সে তার মিথ্যা ও কৃত্রিমতার দ্বারা মানুষকে সঠিক পথ হ'তে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যেতে পারে। অতঃপর শয়তানের বিষয়টি আল্লাহ মানুষকে অবহিত করেন এবং তার (শয়তানের) মিথ্যা ফাঁদে না পড়ার জন্য মানুষকে হুঁক্বিয়ার করেন। এতে চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষেরা উপকৃত হয় এবং আল্লাহ্র আদেশে ইবাদতের পথে অবিচল থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যত কল্যাণময় হয়। কিন্তু যারা চিন্তা ও বিবেচনার আশ্রয় না নিয়ে শয়তানের মিথ্যা লোভনীয় কথায় বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ্র ইবাদতে সন্দেহ পোষণ করে অকল্যাণের মধ্যে নিপতিত হয় এবং তাদের ভবিষ্যত ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলে যায়। উপরের ঘটনাপ্রবাহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

Contents

পৃথিবী সৃষ্টির পর হাযার হাযার বা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে ধর্ম ও অধর্মের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। অতঃপর এক সময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের সীমালংঘনের কারণে ধ্বংসলীলার বিষয়টি মানুষের সম্মুখে উন্মোচন করেন। অবশ্য তার আগে আল্লাহ মানুষকে তাঁর অসীম সৃষ্টি ও ক্ষমতার বিষয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়েছেন। ধ্বংসের বা শাস্তির মর্মান্তিক বর্ণনা দিয়েও আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন।

মানুষ সৃষ্টির পর আল্লাহ মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক হিসাবে যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা দুনিয়াতে শয়তান ও তার সঙ্গী-সাথীর চক্রান্তে পড়ে নানারূপ দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا– ‘এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়’ *(আন‘আম ৬/১১২)*। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَعَادًا وَثَمُوْدَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ– ‘আর আমরা ‘আদ ও ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদের অপকর্ম সমূহকে শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করেছিল। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিয়েছিল। অথচ তারা এর পরিণাম বুঝত’ *(আনকাবূত ২৯/৩৮)*।

প্রাচীনকালের ঐসব ভয়ংকর ধ্বংসকাহিনী পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র প্রিয় নবীর উম্মত যেন সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের পূর্ব যুগের বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। আর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে তাদের রাসূলগণ এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনার মত লোক ছিল না। এভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে বদলা দিয়ে থাকি। অতঃপর তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করলাম। যাতে দেখতে পারি কিভাবে তোমরা কাজ কর’ *(ইউনুস ১০/১৩-১৪)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যারা কাফের, তারা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় লিপ্ত। এদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। সে সময় তারা আর্তনাদ করেছে। কিন্তু তখন তাদের বাঁচার কোন উপায় ছিল না। তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছে। ফলে কাফেররা বলে যে, এ ব্যক্তি একজন জাদুকর ও মহামিথ্যাবাদী’ *(ছোয়াদ ৩৮/১-৪)*।

পবিত্র কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের উপদেশ ভাণ্ডার মানুষের জন্য চির কল্যাণকর বিষয়সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু সে সময় এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী বান্দা ছিল না বললেই চলে। তারা বহু উপাস্যের উপাসনা করত এবং তারা ছিল শক্তিশালী সম্প্রদায়। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) কুরআনের উপদেশ প্রচারে বাধাগ্রস্ত হন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে অতীত নবী-রাসূল ও তাঁদের সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের পরিণতির বর্ণনা দিয়ে তাঁকে তা প্রচারের আদেশ দেন এবং সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দেন।

মহান আল্লাহ বলেন,‘যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তাহ’লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। মুত্তাক্বীদের উপর ঐসব যালেমদের হিসাবের ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। তবে উপদেশ দেওয়া ব্যতীত, যাতে ওরা আল্লাহভীরু হয়’ *(আন‘আম ৬/৬৮-৬৯)*। একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন’ *(আন‘আম ৬/১৫৯)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘আর তোমার পূর্বে আমরা লোকদের নিকট অহীসহ যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তারা মানুষ ছিল। অতএব তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জানো। আমরা তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না। আর তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। অতঃপর আমরা তাদেরকে (নবীদেরকে) দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। অতঃপর তাদের মুক্তি দিলাম এবং (তাদের অনুসারী) যাদেরকে আমরা ইচ্ছা করলাম। আর ধ্বংস করলাম যালেমদের। আমরা তোমাদের প্রতি কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি। যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? *(আম্বিয়া ২১/৭-১০)*।

ক্ষুদ্র হ’তে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হ’তে বৃহত্তম ধ্বংসলীলার সংবাদও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রতম ধ্বংস বলতে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বা আরও কিছু বড় ধ্বংসলীলার ঘটনাকে বুঝায়। এ বিষয়ে নানা প্রকারের ধ্বংসকাহিনীর উদাহরণ রয়েছে। যেমন একটি মোটর সাইকেলে এক বা দু’জন আরোহী পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় পড়ে মর্মান্তিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত (মৃত্যু) হয়। আবার কোন কোন সময় ছোট ছোট যানবাহনে চলাচলের সময় স্বপরিবারে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে গোটা পরিবারই নিদারুণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু বৃহৎ ধ্বংসযজ্ঞ আছে, যেগুলো প্রায় সারাবছর পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সংঘটিত হয়। সেগুলো হ’ল ভূমিকম্প, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এগুলোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মানুষের অজানা অনেক ধ্বংসলীলাও আছে- যে সম্বন্ধে মানুষ চিন্তাই করে না। যেমন কোন ছোটখাট কারণে মানুষ মানুষকে আঘাতমূলক কথাবার্তা বলে, নানারূপ অসৎ আচরণে ভীষণভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে, এতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি

Contents

আঘাতদাতাকে অভিশাপ দেয় এবং আল্লাহও তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ অতঃপর তা ধ্বংসরূপ ধারণ করে। যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এখানে নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবদ্দশার একটি মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করা হ'ল।-

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদারত ছিলেন এই সময় কুরাইশদের কিছু লোক তাকে বেষ্টন করেছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুঈত একটি উটের নাড়ী-ভূড়ি নবী করীম (ছাঃ)-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করলো। তিনি মস্তক অবনত করে সিজদাতেই থাকলেন। এ সময়ে ফাতেমা (রাঃ) এসে তাঁর ঘাড়ের উপর হ'তে নাড়ী-ভূড়ি ফেলে দিলেন এবং যারা এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে তাদের জন্য বদদো'আ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) বদদো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ কুরাইশ দলকে ধ্বংস করে দিন। হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনে হেশাম, উতবা ইবনে রাবী'আ, শায়বাহ ইবনে রাবী'আ, উকবা ইবনে আবু মুঈত এবং উমাইয়া ইবনে খালাফকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহে) উবাই ইবনে খালাফকে ধ্বংস করুন। আব্দুল্লাহ বলেন, এদের অধিকাংশকে আমি বদরের যুদ্ধে নিহত হ'তে দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া সবার লাশকে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উমাইয়া অথবা উবাইয়ের দেহ ছিল মাংসল ও মেদবহুল। কূপে নিক্ষেপের জন্য ছাহাবাগণ যখন তার লাশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় তার দেহের জোড়ায় জোড়ায় খুলে যায়। *(বুখারী, 'জিহাদ' অধ্যায় হা/২৯৪৬)*।

অপর এক হাদীছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ভোরের (পূবালী বাতাস) হাওয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং দুপুর (এক প্রকার ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা মরু বায়ু) দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে' *(বুখারী 'জিহাদ' অধ্যায় হা/৩০৯৬)*।

অপরদিকে বৃহত্তম ধ্বংসলীলা হ'ল ক্বিয়ামত, যা আমরা সবাই জানি। কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষ এতে বিশ্বাসী নয়। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ক্বিয়ামত দিবস হ'ল পৃথিবী ধ্বংসের দিবস। পক্ষান্তরে যারা কুরআনে বা আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, বড় বড় বিজ্ঞানীদের মতে সমস্ত সৃষ্টবস্তু প্রকৃতির দান।

ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ সম্বন্ধে লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করত, এ সম্বন্ধে আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-কে বলেন, 'তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সেটি হবে একটি ভয়ংকর বিষয়। যা তোমাদের নিকটে আসবে আকস্মিকভাবে। তারা তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যেন তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত! বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(আ'রাফ ৭/১৮৭)*।

ক্বিয়ামত হ'ল পৃথিবী ধ্বংসের দিবস, মহাদিবস, প্রতিফল দিবস ও শেষ দিবস। ঐ দিবস সমুদয় সৃষ্টির নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে। একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র সত্ত্বা সমুন্নত, অক্ষয়, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আল্লাহ্র ঘোষণা হ'ল, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র তোমার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্ত্বা ছাড়া' *(আর-রহমান ৫৫/২৬-২৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَـــوْمٌ عَسِيْرٌ، عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ– 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। সেদিন হবে খুব কঠিন দিন। যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৮-১০)*।

তিনি আরো বলেন, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ– 'অতঃপর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে। অতঃপর একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আকাশ সেদিন বিদীর্ণ হয়ে তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হবে। ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং আপনার প্রভুর আরশ আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে বহন করবে' *(হাক্কা ৬৯/১৩-১৭)*।

আল্লাহ আরো বলেন, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ– 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যেদিন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, যেদিন সাগরসমূহ উত্তাল হবে, যেদিন কবরসমূহ উন্মুক্ত হবে, সেদিন প্রত্যেকে জানবে সে অগ্রে ও পশ্চাতে কি প্রেরণ করেছে' *(ইনফিতার ৮২/১-৫)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ– 'অতঃপর যখন তার চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে। সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাব? *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৭-১০)*।

যারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাস করে না বরং অস্বীকার করে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, 'বরং তারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে। আর যারা ক্বিয়ামতে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। দূর থেকে আগুন যখন তাদের দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুংকার। আর যখন তাদেরকে বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় ওর একটি সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেওয়া হবে, যেন তারা সেখানে

Contents

নিজেদের ধ্বংসকে আহ্বান করবে। (বলা হবে) আজ তোমরা কেবল একবার ধ্বংস আহ্বান করো না, বরং বহুবার ধ্বংসকে আহ্বান করো' *(ফুরক্বান ২৫/১১-১৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ، يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ– 'ক্বিয়ামত ওদের শাস্তির নির্ধারিত কাল, আর সে ক্বিয়ামত হবে বড় কঠিন বড় তিক্ত। অপরাধীরা হবে বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। সেদিন ওদেরকে উপুড় করে ফেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ আস্বাদন কর' *(কামার ৫৪/৪৬-৪৮)*।

সবশেষে যে ধ্বংসযজ্ঞ আগমন করবে তারই নাম 'ক্বিয়ামত'। ক্বিয়ামত দিবসের দীর্ঘতা ৫০ পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। ক্বিয়ামতের দিন সবকিছু আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তিনি প্রতিটি মানুষের বিচার করবেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগতদের পুরস্কৃত করবেন। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের ভয়াবহ ধ্বংসের দরিয়ায় নিক্ষেপ করবেন। মানব, জিন ও শয়তানের ধ্বংসের জন্য নির্মিত দরিয়ার প্রধান উপাদান আগুন। সে আগুন বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। পৃথিবীর আগুনের মত সাধারণ আগুন নয়?

ক্বিয়ামত দিবসের দীর্ঘতার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ 'যে সিঁড়ি দিয়ে ফেরেশতাগণ ও জিব্রীল দৈনিক ঊর্ধ্বারোহন করে আল্লাহ্র দিকে। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান' *(মা'আরিজ ৭০/৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত ও তারা হবে হীনতায় আচ্ছন্ন। সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে (দুনিয়াতে) দেওয়া হ'ত' *(মা'আরিজ ৭০/৪৩-৪৪)*।

ক্বিয়ামত দিবসই বিচার দিবস, এ বিষয়ে মহাবিচারক আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই বিচার দিবস সুনির্ধারিত। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তা বহু দরজা বিশিষ্ট হবে আর পর্বতমালা চালিত হবে। অতঃপর তা মরীচিকা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে। সীমালংঘনকারীদের ঠিকানা রূপে' *(নাবা ৭৮/১৭-২২)*।

ক্বিয়ামতে সন্দেহ পোষণকারীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে, সত্বর আমরা তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবো। যখন তাদের চামড়াগুলো দগ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমরা তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে। যাতে তারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/৫৬)*।

এই ক্বিয়ামত দিবসের ধ্বংসলীলার একটা অংশবিশেষ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের অবগতির জন্য তিনি যৎসামান্য বর্ণনা করেছেন। তবে মানুষকে বিশ্বাস করতেই হবে যে, যে যতখানি পাপ ও সীমালংঘন করেছে তাকে সেই পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি তাদের দেখনি যারা আল্লাহ্র নে'মতকে কুফরীতে পরিবর্ধন করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে? আর তা হ'ল জাহান্নাম। সেখানে তারা প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট আবাস সেটি। আর তারা আল্লাহ্র জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে যাতে তাঁর পথ হ'তে লোকদের বিচ্যুত করতে পারে। বলে দাও, কিছুদিন মজা উপভোগ কর। কেননা তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হ'ল জাহান্নাম' *(ইবরাহীম ১৪/২৮-৩০)*।

ক্বিয়ামত অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, 'বরং তারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে। আর যারা ক্বিয়ামতে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। দূর থেকে আগুন যখন তাদের দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুংকার' *(ফুরকান ২৫/১১-১২)*।

বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহভীরুদের অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হ'ত। তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন' *(ক্বাফ ৫০/৩১-৩৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের প্রতিপালক তাদের সুপথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে। নে'মতপূর্ণ জান্নাতে তাদের তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ' এবং পরস্পরের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(ইউনুস ১০/৯-১০)*।

পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হিসাবে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, তাছাড়া এটা আল্লাহ্র ওয়াদাও। এতে আল্লাহদ্রোহী পাপীরা ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহভীরু পুণ্যবানরা পুরস্কৃত হবে। সেদিন মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পৃথিবী জীবনের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির অভিযোগ করতে পারবে বা বিচার চাইতে পারবে এবং ন্যায়বিচার পাবে। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ হাত, পা, চোখ, মুখ, কান, ত্বক প্রভৃতিও তাদের কর্মের সাক্ষ্য দিবে।

ক্বিয়ামতের বিচার শেষে পুণ্যবানদের জন্য জান্নাতের সুখ-শান্তি, ভোগবিলাস। অনুরূপভাবে পাপীষ্ঠদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থাকবে। মানুষ, জিন ও শয়তান ব্যতীত আর কোন প্রাণী শাস্তির শিকার নয়। অতএব আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের শাস্তিতে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

Contents

বাম দলগুলোতে লেনিনের সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে

-বদরুদ্দীন উমর

*[বদরুদ্দীন উমরের পিতা আবুল হাশেম (১৯০৫-১৯৭৪ খৃ.) ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। ১৯৩৬ সালে তিনি বর্ধমান থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালের ৭ই নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান 'ইসলামী একাডেমী'র প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। যা বর্তমানে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' নামে পরিচিত। পারিবারিকভাবে রাজনীতি সচেতন ও অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন বদরুদ্দীন ওমর পিতার চলার পথ ছেড়ে বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পিতা ইসলামের পথেই মানুষের মুক্তি ও দেশে শান্তি কামনা করেছিলেন। পিতার স্বপ্নের প্রথম ধাপ পূরণ হয়েছিল স্বাধীন পাকিস্তান লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপ তথা প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি মুসলিম নামধারী ধূর্ত নেতাদের কারণে। পুত্র ভেবেছিলেন তার বিপরীত। সারা জীবন বাম রাজনীতি করে ধীমান সন্তান বার্ধক্যে এসে যে স্মৃতিচারণ করেছেন, তার মধ্যে সমাজ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ ডান-বাম সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে ভেবেই আমরা তাঁর সাক্ষাৎকারটি হুবহু **আত-তাহরীকের** পাঠকদের জন্য সংকলন করে দিলাম। যাতে আমাদের পাঠকদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত হানে। সেই সাথে দৈনিক প্রথম আলো-কে ধন্যবাদ এই বর্ষিয়ান দার্শনিক ও রাজনীতিকের মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ ও পত্রস্থ করার জন্য। নিম্নরেখাগুলি আত-তাহরীকের দেওয়া' (স.স.)।]*

বদরুদ্দীন উমর বিশিষ্ট বামপন্থী তাত্ত্বিক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ; শতাধিক গ্রন্থের লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৩১ সালে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থশাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জন করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং পরে এ বিষয়ে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। কিছু সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে সক্রিয় হন। বর্তমানে তিনি 'জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল' এবং 'সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী কমিটি' নামে দু'টি সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশ্ন-১ : আপনি সারা জীবন বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও একসময় বামপন্থী রাজনীতির প্রতি মানুষের বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। গত শতকের আশির দশকে আমি আমার ছাত্রজীবনেও সেটা দেখেছি। কিন্তু এখন বামপন্থী রাজনীতি খুব ক্ষীয়মাণ। এর কারণ কী?

উত্তর : আপনি আপনার ছাত্রজীবনে, আশির দশকে যা দেখেছেন, চল্লিশের দশকে আমি আমার ছাত্রজীবনে তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখেছি। বিরাট একটা প্রত্যাশা জেগেছিল যে দুনিয়ায় একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে হারিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন জার্মানি বা জাপানের মতো বাইরের সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সব নাগরিকের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের উপনিবেশগুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিল। ফলে সারা দুনিয়ায় মানুষের মুক্তির ব্যাপারে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল, চারদিকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল। ভারত উপমহাদেশেও এটা ঘটেছে।

প্রশ্ন-২ : কিন্তু এখানে বামপন্থী রাজনীতি তো প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের নামে সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে গেল, তারপরে সেই সন্ত্রাসবাদের পতন হ'লো, তারপরে আবার একটা রাজনীতি শুরু হ'লো, যেটাকে বলে সংসদীয় রাজনীতি। পঞ্চাশের দশকে যখন এসব ঘটছে, তখনো কিন্তু সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিয়ে আশা-উদ্দীপনা ছিল। তারপর 'স্তালিনে'র মৃত্যুর পর 'খ্রুশ্চভ' ভিন্ন পথ নিলেন, তারপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হ'লো, দেশে দেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে গেল। তাছাড়া চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে আমেরিকা, পাকিস্তান ইত্যাদি দুনিয়ার যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের সঙ্গে গেল। ফলে আগে চিন্তার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। লেনিন তো পরিত্যক্ত হ'লেনই, এমনকি চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সব বইপত্র বাদ দিয়ে লাল বই পড়া শুরু হ'লো, তার ফলে মাও সে-তুংয়ের গুরুত্বপূর্ণ লেখা পত্রও পরিত্যাগ করা হ'লো। চীন বলত যে সশস্ত্রভাবে সংগ্রাম করতে হবে, সেই মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম বা গেরিলাযুদ্ধ করার মতো প্রকৃত পরিস্থিতি এখানে ছিল না বলে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিল। মাও বলেছিলেন, গেরিলারা হ'লো মাছ আর জনগণ হ'লো পানি, কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলোতে অবস্থা দাঁড়াল পানি ছাড়াই মাছের মতো। এসব করে ভারত উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৩ : রাশিয়া ও চীনে বিপ্লব হয়েছে, ভারতে হ'লো না কেন?

উত্তর : রাশিয়া ও চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যে ভিত্তি ছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে তা ছিল না। এখানে পার্টিতে মধ্য শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কোনো লক্ষ্য, রণনীতি ও কর্মসূচি কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশদের তাড়িয়ে নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে এমন কথা কখনো উচ্চারণ করেনি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এটা ধরে নিয়েই রাজনীতি করেছিল। অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি নয়, ভারতীয়

বুর্জোয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যই তারা কাজ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব করার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে যাওয়া। তৃতীয়তঃ নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করা। সংসদীয় রাজনীতি ও নির্বাচন ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রকৃতিতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটাল। একের পর এক নির্বাচন হতে লাগল, সেসব নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশ নিতে লাগলেন, ফলে কমিউনিস্ট রাজনীতি সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে ঢুকে গেল। এই কাঠামোতে কমিউনিস্টদের প্রতিদ্বন্দ্বী তো কোনো বিপ্লবী শক্তি নয়, তারা অন্যান্য সংসদীয় রাজনৈতিক দল, যাদের মূল চরিত্র বুর্জোয়া। কাজেই কমিউনিস্টরা আসলে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর বাম অংশ হিসেবে নেমে পড়লেন।

প্রশ্ন-৪ : এখন বাংলাদেশের বাম রাজনীতির কথা বলুন।

উত্তর : বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির দুরবস্থা রাতারাতি হয়নি। এর ঐতিহাসিক কারণ আছে। আমাকে শহীদুল্লা কায়সার বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে এখানে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। তারপর যখন রণদীভের থিসিসের পরে সন্ত্রাস, নির্যাতন ইত্যাদি হ'লো, কমিউনিস্টদের অনেকে দেশত্যাগ করে চলে গেলেন। এসবের ফলে ১৯৫০-এর পরে এখানে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ১২ হাজার থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২০০। তার মধ্যেও যাঁরা নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন, তাঁরা এখান থেকে চলে গেলেন। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের অভাবও এখানে দেখা দিল। আমি ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই, আমি তো আমার পার্টির নেতৃত্বে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খুব সামর্থ্যবান কোনো নেতা পাইনি।

প্রশ্ন-৫ : তাহ'লে কেন যোগ দিয়েছিলেন?

উত্তর : কারণ, সেই সময় ওটার চেয়ে ভালো আর কিছু ছিল না। যাই হোক, তত দিনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে গেছে। তবু পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট আন্দোলন অনেকটা দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পরে তা-ও আর থাকল না। একাত্তর সালে কমিউনিস্টদের বিরাট নির্বুদ্ধিতার কারণে ভীষণ ক্ষতি হ'লো। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তো আওয়ামী লীগের ভেতরে ঢুকে গেল; আর পিকিংপন্থী বলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান কিছু ছিল বলে তো মনে হয় না। আমি তো পিকিংপন্থীদের সঙ্গে ছিলাম, একাত্তর সালে আমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই। তাঁরা মাও সে-তুংয়ের যুক্তফ্রন্টের কথা বলতেন, কিন্তু আমাদের এখানে এ রকম একটা যুদ্ধের সময় যেখানে যাঁরা আছেন, সবাইকে নিয়ে যে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করা দরকার, এই বিষয়টা গুরুত্ব পেল না। অবশ্য প্রথমে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সবার সঙ্গে মিলে কাজ করা হবে, এমনকি আওয়ামী লীগের সঙ্গেও; মাওলানা ভাসানীও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ১৪ই এপ্রিল চৌ এন লাইয়ের যে বার্তাটা এল, তাতে তিনি বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে লড়াই চলছে, সেটা কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদীর কাজ, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একসঙ্গে থাকতে চায় এবং পাকিস্তান অখণ্ড থাকলেই পাকিস্তানের জনগণের সমৃদ্ধি ঘটবে। তাদের তো এই কথা বলার এখতিয়ার ছিল না। আমি তখন যশোরের একটা গ্রামে ছিলাম, শোনার পরে তাড়াতাড়ি ঢাকায় ছুটে এলাম, এসে দেখি সর্বনাশ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেটা দেখলাম একদম উল্টে গেছে। বলা হ'লো এখন আওয়ামী লীগকে শত্রু মনে করতে হবে; দুই কুকুরের লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সেই সময় পার্টির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ডিসেম্বরে আমি পার্টি থেকে ইস্তফা দিলাম।

প্রশ্ন-৬ : কিন্তু আশির দশকে যে বামপন্থী আন্দোলন বেগবান হয়েছিল, সেটা আর অগ্রসর হ'লো না কেন?

উত্তর : শুনুন, সত্তরের দশকটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ। তারপর আশির দশকে যে আন্দোলনটা হ'লো, সেটা ছিল একধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন। সেই আন্দোলনটাও সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই ছিল; সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যেখানে কথা বলার স্বাধীনতা থাকবে, নির্যাতন থাকবে না, মানুষকে কথায় কথায় ধরে নিয়ে যাওয়া হবে না, অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্বাচিত সরকারের জন্য আন্দোলন। এর বেশী কিন্তু এটা ছিল না। আপনি যদি বলেন যে, আশির দশকে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলন চাঙা হয়েছিল, সেটা কিন্তু হয়নি।

প্রশ্ন-৭ : তাহ'লে বামপন্থী দলগুলোকে চরিত্রগত দিক থেকে আপনি কী ধরনের রাজনৈতিক দল বলবেন?

উত্তর : এখনকার সিপিবি হ'ল বাকশালের গর্ভে জন্ম নেওয়া একটা পার্টি; এটার তো আগের কোনো চরিত্রই থাকল না। কাজেই এর দ্বারা কোনো বিপ্লবী চিন্তা বা বিপ্লবী কাজ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-৮ : সিপিবি ছাড়াও তো অনেক বামপন্থী দল আছে, তাদের অবস্থা কী?

উত্তর : ছোট ছোট বাম দলের ব্যাপারে মুশকিল হচ্ছে, এখানে লেনিনের সংখ্যা খুব বেশী হয়ে গেছে। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের যে ছোট ছোট স্টাডি সার্কল আছে, তাদের প্রত্যেকেই মনে করে, এ দেশে কোনো কমিউনিস্ট আন্দোলন নেই; কিছু লোক বলে, এ দেশে কোনো দিন কোনো কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল না ইত্যাদি; এবং প্রত্যেকেই মনে করে যে, সে লেনিন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কেউ হয়তো একটা ছোট দল করে, কেউ হয়তো দুই-দশজন নিয়ে আন্দোলন করে; কিন্তু তারা সবাই যে একসঙ্গে কাজ করবে বা এ ধরনের কোনো চিন্তা করবে এটা নেই। কাজেই তারা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু মার্ক্সবাদী সাহিত্যচর্চা করে, পত্রিকা বের করে ইত্যাদি করে। কিন্তু আসলে কোনো বিপ্লবের চিন্তা এখানে দেখাই যায় না।

প্রশ্ন-৯ : কিন্তু যেটাকে আপনি বিপ্লব বলছেন, যেমন অক্টোবর

বিপ্লবের মতো বিপ্লব আমাদের দেশে হওয়া আদৌ সম্ভব কি না?

উত্তর : কোনো দেশের বিপ্লবই অন্য দেশে পুনরাবৃত্ত হয় না। অক্টোবর বিপ্লবের মতো বিপ্লব কি চীনে হয়েছিল? ভিয়েতনামে কি তাই হয়েছিল? প্রতিটি বিপ্লবেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রশ্ন-১০ : বাংলাদেশে কী ধরনের বিপ্লব হওয়া সম্ভব?

উত্তর : বাংলাদেশের বিপ্লব বাংলাদেশের মতো করেই হবে। সেটা করতে হ'লে যারা বিপ্লব করবে, তাদেরকে প্রথমেই চিন্তা-ভাবনায় সাবালক হতে হবে। নাবালকের মতো বাইরে থেকে যা বলছে, সেইভাবে বললে হবে না। আমার দেশের অবস্থা লেনিন-মাও সে-তুংয়ের চেয়ে আমার বেশী বোঝা দরকার। সেটা যদি আমি না বুঝি, তাহ'লে আমি বিপ্লব করতে পারব না।

প্রশ্ন-১১ : আমাদের দেশে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত লোকজন সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে তাঁরা ধর্ম মানেন না। এটা কি এ দেশের বাম রাজনীতির জন্য বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে?

উত্তর : না, আমি মনে করি না যে এটা বড় ধরনের কোনো সমস্যা। আপনি যদি আসল কাজ করেন, তাহ'লে আপনি ধর্ম মানেন কি না, সেটা সাধারণ মানুষ দেখে না। এটা আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। আন্ডারগ্রাউন্ডে আমি যেসব মানুষের বাড়িতে থেকেছি, তারা খুব ধর্ম পালন করত, তারা ভালোভাবেই জানত যে আমি ধর্ম-কর্ম করি না, তবু তো তারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, খাইয়েছে, ঘুমানোর জায়গা দিয়েছে। আপনি যখন তাদের জন্য কাজ করবেন, তখন তারা ধর্মের প্রসঙ্গই তুলবে না। লেনিন এক জায়গায় লিখেছেন, এক জায়গায় ধর্মঘট হচ্ছে, তখন পাদরিরা প্রচার করতে শুরু করেছে যে এরা ধর্ম মানে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা কখনোই ধর্মের কথা নিয়ে আসব না, আমরা আমাদের কাজ করব। মানুষ যখন দেখবে যে আমরা তাদের জন্য কাজ করছি, তখন পাদরি কী বলছে, সেই কথা তারা শুনবে না।

প্রশ্ন-১২ : আপনি একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, সারা জীবন ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করছেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আপনার কাছে জানতে চাইব, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পঠন-পাঠন, জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতাসহ সামগ্রিক যে অবক্ষয় ঘটেছে, তা কেন এবং কী করে হ'লো?

উত্তর : শুনুন, সমাজ একটা অখণ্ড জিনিস। সমাজের একটা জায়গা কলুষিত থাকবে আর একটা জায়গা পবিত্র থাকবে, এ রকম হয় না। সমাজের প্রতিটা অংশ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ের বাইরে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন-১৩ : এই অবক্ষয় থেকে বেরোনোর উপায় কী?

উত্তর : বেরোনোর উপায় এই পুরো সমাজটার নতুন রূপান্তর ঘটানো। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটছে, তা বাইরেই থাকবে আর বিশ্ববিদ্যালয় একটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, এটা তো হতে পারে না।

প্রশ্ন-১৪ : কিন্তু সে রকম বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন বা বিপ্লব কীভাবে হতে পারে?

উত্তর : কীভাবে হবে সেটা আলাদা কথা। একটা কথা শুধু বলা যেতে পারে যে, পরিবর্তন না হ'লে বর্তমান অবস্থা থেকে বেরোনো যাবে না। একটা সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এর থেকে বেরোনো যাবে না। কিন্তু সেটা কীভাবে হবে, কারা করবে, সেটা আমি এই সাক্ষাৎকারের স্বল্প পরিসরে বলতে পারি না। আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে সেই বিপ্লব হতেই হবে; এই আশাবাদ তো আমাদের রাখতেই হবে।

প্রথম আলো : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। **বদরুদ্দীন উমর :** আপনাকেও ধন্যবাদ।

(দৈনিক প্রথম আলো, ২৩শে জুলাই'১৭, মতামত কলাম, পৃ. ১০)।

প্রতিক্রিয়া : জাহিদ হায়দার (কবি ও লেখক)

...বদরুদ্দীন উমরের কথা থেকে মনে হয়, তিনি ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর পার্টিতে ছিলেন। ডিসেম্বরে তিনি পার্টি থেকে ইস্তফা দিলেন। তাহ'লে কি বিষয়টি এই দাঁড়াল না যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়, এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আট মাস দুই কুকুরের লড়াইকে দ্বন্দ্বের বোধ নিয়ে সমর্থন করে গেছেন? তা যদি না হবে, তাহ'লে তিনি যশোর থেকে ফিরে যখন বুঝলেন যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, তখনই কেন পার্টি থেকে ইস্তফা দিলেন না?

বদরুদ্দীন উমর জানেন কি না জানি না, তবে আমার জানা আছে: মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করতে যাওয়ার পথে কিংবা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসার পর অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে পিকিংপন্থীরা কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে *(দৈনিক প্রথম আলো, ২৫শে জুলাই'১৭, মতামত কলাম, পৃ. ১০)।*

সাক্ষাৎকারটির সার-সংক্ষেপ :

(১) ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের নামে সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে গেল, তারপরে সেই সন্ত্রাসবাদের পতন হ'লো, তারপরে আবার একটা রাজনীতি শুরু হ'লো, যেটাকে বলে সংসদীয় রাজনীতি।

(২) 'স্তালিনে'র মৃত্যুর পর 'খ্রুশ্চভ' ভিন্ন পথ নিলেন, তারপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হ'লো, দেশে দেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে গেল। তাছাড়া চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে আমেরিকা, পাকিস্তান ইত্যাদি দুনিয়ার যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের সঙ্গে গেল। ফলে আগে চিন্তার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেল।... চীন বলত যে সশস্ত্রভাবে সংগ্রাম করতে হবে, সেই মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম বা গেরিলাযুদ্ধ করার মতো প্রকৃত পরিস্থিতি এখানে ছিল না বলে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিল। মাও বলেছিলেন, গেরিলারা হ'লো মাছ আর জনগণ হ'লো পানি, কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলোতে অবস্থা দাঁড়াল পানি ছাড়াই মাছের মতো। এসব করে ভারত উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

(৩) ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার জন্য কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন : (ক) রাশিয়া ও চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যে ভিত্তি ছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে তা ছিল না। এখানে পার্টিতে মধ্য শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। (খ) শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কোনো লক্ষ্য, রণনীতি ও কর্মসূচি কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। (গ) জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব করার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে যাওয়া। (ঘ) নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করা। ফলে কমিউনিস্টরা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর বাম অংশ হয়ে পড়লেন।

(৪) বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে এখানে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। নির্যাতনের কারণে নেতৃস্থানীয় অনেকে দেশ ত্যাগ করেন। ফলে ১৯৫০-এর পরে এখানে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ১২ হাজার থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২০০। তার মধ্যেও যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাঁরা এখান থেকে চলে গেলেন। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের অভাব দেখা দিল। আমি ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই, আমি তো আমার পার্টির নেতৃত্বে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খুব সামর্থ্যবান কোনো নেতা পাইনি। (খ) পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট আন্দোলন অনেকটা দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পরে তা-ও আর থাকল না। একাত্তর সালে কমিউনিস্টদের বিরাট নির্বুদ্ধিতার কারণে ভীষণ ক্ষতি হ'লো। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তো আওয়ামী লীগের ভেতরে ঢুকে গেল; আর পিকিংপন্থী বলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান কিছু ছিল বলে তো মনে হয় না।... (গ) ১৪ই এপ্রিল (চীনের প্রধানমন্ত্রী) চৌ এন লাইয়ের যে বার্তাটা এল, তাতে তিনি বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে লড়াই চলছে, সেটা কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদীর কাজ, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একসঙ্গে থাকতে চায় এবং পাকিস্তান অখণ্ড থাকলেই পাকিস্তানের জনগণের সমৃদ্ধি ঘটবে।... বলা হ'লো এখন আওয়ামী লীগকে শত্রু মনে করতে হবে; দুই কুকুরের লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সেই সময় পার্টির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ডিসেম্বরে আমি পার্টি থেকে ইস্তফা দিলাম।

(৫) এখনকার সিপিবি হ'লো বাকশালের গর্ভে জন্ম নেওয়া একটা পার্টি; এটার তো আগের কোনো চরিত্রই থাকল না। কাজেই এর দ্বারা কোনো বিপ্লবী চিন্তা বা বিপ্লবী কাজ সম্ভব নয়। (খ) ছোট ছোট বাম দলের ব্যাপারে মুশকিল হচ্ছে, এখানে লেনিনের সংখ্যা খুব বেশী হয়ে গেছে।... তারা সবাই যে একসঙ্গে কাজ করবে বা এ ধরনের কোনো চিন্তা করবে এটা নেই। কাজেই তারা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু মার্ক্সবাদী সাহিত্যচর্চা করে, পত্রিকা বের করে ইত্যাদি করে। কিন্তু আসলে কোনো বিপ্লবের চিন্তা এখানে দেখাই যায় না।

(৬) বাংলাদেশের বিপ্লব বাংলাদেশের মতো করেই হবে। সেটা করতে হ'লে যারা বিপ্লব করবে, তাদেরকে প্রথমেই চিন্তা-ভাবনায় সাবালক হতে হবে। নাবালকের মতো বাইরে থেকে যা বলছে, সেইভাবে বললে হবে না। আমার দেশের অবস্থা লেনিন-মাও সে-তুংয়ের চেয়ে আমার বেশী বোঝা দরকার। সেটা যদি আমি না বুঝি, তাহ'লে আমি বিপ্লব করতে পারব না।

(৭) আমি মনে করি না যে এটা (ধর্ম) বড় ধরনের কোনো সমস্যা। আপনি যদি আসল কাজ করেন, তাহ'লে আপনি ধর্ম মানেন কি না, সেটা সাধারণ মানুষ দেখে না।... মানুষ যখন দেখবে যে আমরা তাদের জন্য কাজ করছি, তখন পাদরি কী বলছে, সেই কথা তারা শুনবে না।

(৮) সমাজ একটা অখণ্ড জিনিস। সমাজের একটা জায়গা কলুষিত থাকবে আর একটা জায়গা পবিত্র থাকবে, এ রকম হয় না। সমাজের প্রতিটা অংশ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ের বাইরে থাকতে পারে না।

(৯) এই অবক্ষয় থেকে বেরোনোর উপায় হ'ল পুরো সমাজটার নতুন রূপান্তর ঘটানো।

(১০) একটা সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এ থেকে বেরোনো যাবে না। কিন্তু সেটা কীভাবে হবে, কারা করবে, সেটা আমি এই সাক্ষাৎকারের স্বল্প পরিসরে বলতে পারি না। আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে সেই বিপ্লব হতেই হবে; এই আশাবাদ তো আমাদের রাখতেই হবে।

সারকথা :

(১) তারা মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালবাসেননি। বরং সর্বহারা ও বুর্জোয়া এবং কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে বিভক্ত করে দেখেছেন (অথচ ধনী-গরীব দু'টিই আল্লাহ্র সৃষ্টি। যা সমান করার ক্ষমতা কারু নেই। উভয় শ্রেণীতেই ভাল ও মন্দ দু'ধরনের লোক রয়েছে)। (২) প্রধানতঃ রাশিয়া ও চীনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। (৩) সন্ত্রাসের পথে যাওয়া এবং সংসদীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাই এই আন্দোলনের পতনের প্রধান কারণ। (৪) সামাজিক বিপ্লব ছাড়া বর্তমান পতন দশা থেকে উত্তরণের কোন পথ নেই (অথচ সামাজিক বিপ্লব করার জন্য কোন স্থায়ী আদর্শ তাদের নেই)।

আমাদের মূল্যায়ন :

সমস্যাগুলি চিরন্তন। আর তা হ'ল স্রেফ 'দুনিয়া অর্জন'। এর সমাধানও চিরন্তন। আর তা হ'ল 'আখেরাতের লক্ষ্যে আল্লাহ্র অহি ভিত্তিক জীবন গঠন'। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটানো। যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবেন আল্লাহ এবং যার দুই অভ্রান্ত সত্যের আলোকস্তম্ভ হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যেটি হ'ল ইসলাম এবং যার বিশুদ্ধ রূপ হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। আর এর মাধ্যমেই আসবে সত্যিকারের সামাজিক বিপ্লব। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত মহান আন্দোলনের কর্মী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(স.স.)*।

আরাকানে পুনরায় বিপন্ন মানবতা

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

রোহিঙ্গা সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার একটি ধারাবাহিক জাতিগত সন্ত্রাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কল্পনাতীত পশুত্ব ও অসভ্যতার এমন জয়জয়কার আধুনিক সভ্যতাগর্বী বিশ্বের ইতিহাসে এক ঘৃণ্যতম কলংকিত অধ্যায়। প্রতিনিয়ত যে সীমাহীন পাশবিকতায় বর্বর মগ বৌদ্ধরা নিরীহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের কচুকাটা করছে, তা নিমিষেই আদিম জংলী সমাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ১৭৯৯ সালে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদের অত্যাচারে শরণার্থী হয়ে দলে দলে আরাকান থেকে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। তারপর আরাকান বার্মা রাজ্যভুক্ত হ'লে অন্ততঃ শতবর্ষের জন্য তারা বর্মী অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু ১৯৪২ সালে মিয়ানমার বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীন হ'লে আবারও রোহিঙ্গা নিধনে মেতে ওঠে বর্মীরা। সেই থেকে অদ্যাবধি দফায় দফায় নিধনযজ্ঞ অব্যাহত আছে। ২০১৭ সালের সর্বশেষ ঘটনায় সমগ্র আরাকান থেকে রোহিঙ্গারা সম্পূর্ণভাবে নির্মূলের পথে। কক্সবাজারের আকাশ-বাতাস এখন লক্ষ লক্ষ স্বামী-সন্তান, পরিবারহারা, সম্ভ্রমহারা রোহিঙ্গা নারী, শিশু, বৃদ্ধ শরণার্থীর রোনাজারিতে ভারি হয়ে উঠেছে। পিছনে তারা রেখে এসেছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর রাইফেলের গুলিতে, চাপাতির আঘাতে, আগুনে পুড়ে কিংবা ধর্ষিতা হয়ে বেঘোরে মারা পড়া শত-সহস্র লাশের বিভৎস সারি। যারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে জঙ্গল, পাহাড়, নদীর দুর্লংঘ্য পথ পাড়ি দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তাদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ ও মানবেতর। জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ের সর্বশেষ শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে তারা। অনাহারে, অর্ধাহারে অসহায় সর্বহারা শরণার্থীরা ভুলে গেছে শোকের ভাষাও। সাম্প্রতিক বিশ্ব সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরাকী শরণার্থীদের দেখেছে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের মত এমন সর্বস্বান্ত ও বিধ্বস্ত শরণার্থী কেউ দেখেনি। মানবিক বিপর্যয়ের এমন করুণ দৃশ্য ভুলিয়ে দিচ্ছে অতীতের সব নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচে'র দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষক তেজশ্রী থাপা মন্তব্য করেছেন, যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসছেন, তাঁদের কারোরই মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার আশা নেই। তিনি বলেন, 'বাস্তব অবস্থা খুব খুব খারাপ। কোন ছবি দিয়ে সেটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি অনেক শরণার্থীদের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু কোন শরণার্থীদের এতটা বিধ্বস্ত অবস্থায় পাইনি'। জাতিসংঘ এই সমস্যাকে 'সবচেয়ে স্বল্প সময়ে সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়গুলোর অন্যতম' বলে বর্ণনা করেছে।

রোহিঙ্গা কারা?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রসিদ্ধ দেশ বার্মা, যার প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মদেশ। ১৯৮৯ সালে তা হয়ে যায় মিয়ানমার। মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ড তথা মধ্যাঞ্চল ৭টি ডিভিশনে বিভক্ত। এর বাইরে রয়েছে আরও ৭টি রাজ্য চিন, কাচিন, কারেন, কায়াহ, মন, শান এবং রাখাইন। রাখাইন রাজ্যটির পূর্বনাম ছিল আরাকান। ইতিহাসে এই নামেই তা পরিচিত। মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এই সমভূমি অঞ্চলের আয়তন ২২ হাযার বর্গমাইল। প্রাকৃতিকভাবে এটি মায়ানমারের মূল ভূখণ্ড থেকে সুউচ্চ আরাকান পর্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। মধ্যযুগে আরাকানের রাজধানীর নাম ছিল ম্রোহাং। সেটারই অপভ্রংশ হ'ল রোহাং বা রোসাঙ্গ। সেখানকার অধিবাসীরা হ'ল রোহিঙ্গা। প্রাথমিক যুগেই তাদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে আরবদের মাধ্যমে। ফলে তারা অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যায়। বহু পূর্ব থেকে আরাকানের আকিয়াব সমুদ্রবন্দরটি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ফলে শুধু আরবরা নয়, আরও বিভিন্ন দেশ থেকে নাবিকরা এখানে ভিড় জমাতো এবং স্থানীয় নারীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ত। সেই সূত্রে বহুজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে রোহিঙ্গাদের মাঝে। ১৪৩০ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যার মধ্যে ২১১ বছর ছিল মুসলিম শাসনাধীন। চট্টগ্রাম তখন ছিল এই রাষ্ট্রেরই অংশ। এই আরাকানী রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রায় ৯২ শতাংশই মুসলমান। বাকীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের মোট জনসংখ্যা ছিল অনধিক ২০ লাখ। তবে বিভিন্ন সময়ে বর্মীদের নির্যাতনে বিদেশে শরণার্থী হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষাধিক। যাদের মধ্যে বাংলাদেশে ৪ লক্ষ, পাকিস্তানে ২ লক্ষ, সঊদী আরবে ২ লক্ষ ও থাইল্যাণ্ডে ২ লক্ষ আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে আরও লক্ষাধিক। বর্তমান সংকট শুরু হওয়ার পর ২৪ আগস্ট'১৭ থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আগতদের নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়েছে।

রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের ধারাবাহিক চিত্র :

বহু জাতি-উপজাতির আবাসস্থল বর্তমান মায়ানমারের ১৩৫টি মতান্তরে ১৩৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি হ'ল রোহিঙ্গা। রাখাইনে তারা ছাড়াও বাস করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বর্মী রাখাইন জাতি, যারা আরাকানে বসবাস শুরু করে ৯ম শতকের পরে। ১৫শ' শতকের প্রথমার্ধে বর্মীরা আরাকান পাহাড় অতিক্রম করে আরাকান রাজ্যে আক্রমণ করে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বর্মীরা আরাকানে বসতি স্থাপন করতে থাকে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, রোহিঙ্গারাই আরাকানের প্রাচীন বাসিন্দা। রাখাইনরা বহু পরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

১৭৮৫ সালে সর্বপ্রথম আরাকান বার্মীজদের দখলীভুক্ত হয়। বর্মী রাজা বোদাওপায়া (১৭৮২-১৮১৯) ক্ষমতায় আসার পর মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করেন। ১৭৯৯ সালে নির্যাতনের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে, হাযার হাযার রোহিঙ্গা মুসলমান প্রথমবারের মত চট্টগ্রামে শরণার্থী হয়। যদিও রাজা পরবর্তীতে অনুতপ্ত হন এবং তার অবস্থান পরিবর্তন করেন। ১৮২১ সালে সেখানে প্রায় ৫ লক্ষ মুসলমানের বসবাস ছিল। ১৯২৪ সালে আরাকানে বৃটিশ শাসন শুরু হ'লে আবার মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হয়। বৃটিশরা বহু সংখ্যক

ইন্ডিয়ানকে আরাকানে নিয়ে আসে কাজের উদ্দেশ্যে, যাদের মধ্যে মুসলিমও ছিল, হিন্দুও ছিল। কিন্তু বার্মার বৌদ্ধরা ইন্ডিয়ান মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে স্থানীয় রোহিঙ্গা তথা বার্মিজ মুসলমানদেরকেও তখন থেকে কালা বা বিদেশী সম্বোধন করা শুরু করে। একই সময়ে তাদের মাঝে ইন্ডিয়াবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হ'তে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা আরও যোরদার হয়। অবশেষে ১৯৩৮ সালে ইন্ডিয়ান অভিবাসীসহ সকল নৃগোষ্ঠীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধরা দাঙ্গা শুরু করে। 'বার্মা কেবল বার্মীজদের জন্য' এই জাতীয়তাবাদী শ্লোগান তুলে তারা গোটা বার্মায় রক্তক্ষয়ী সহিংসতা চালায়। এতে সরকারী হিসাবে তাদের হাতে ২০৪ জন মুসলমান নিহত, অপর ১০০০ জন আহত এবং ১১৩টি মসজিদ ধ্বংস হয়। এভাবে বার্মায় মুসলিম বিদ্বেষ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

১৯৪২ থেকে থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ : ১৯৪২ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশরা সরে গেলে আবারও স্থানীয় রাখাইন বৌদ্ধদের সাথে রোহিঙ্গাদের দাঙ্গা বেঁধে যায় এবং জাপানী বাহিনী ও বার্মীজ বাহিনী সম্মিলিতভাবে রোহিঙ্গাদের উপর হামলা চালায়। ফলে ৪০ হাযারের বেশী রোহিঙ্গা মুসলমান চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে। সেসময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অং সান সুকীর পিতা অং সান বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন রোহিঙ্গাসহ বার্মার মুসলমান নেতারা।

১৯৪০ সালে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হ'লে রোহিঙ্গারা পাকিস্তানের সাথে একত্রিত হওয়ার মনোবাসনায় সংগঠিত হ'তে থাকেন। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে তারা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করেন এবং আরাকানের রাজধানী আকিয়াবে নর্থ আরাকান মুসলিম লীগ গঠনও করেন। কিন্তু মি. জিন্নাহ সম্ভবতঃ এ বিষয়ে বার্মার সাথে কোন দ্বন্দ্বে যেতে চাননি। ফলে তাদের দাবী নাকচ করে দেন। সেদিন যদি তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিতেন, তাহ'লে হয়ত আরাকান রাজ্যের একটি অংশ আজ বাংলাদেশেরই অংশ হ'তে পারত।

মি. জিন্নাহর প্রত্যাখ্যানের পর রোহিঙ্গারা 'মুজাহিদ পার্টি' নামে উত্তর আরাকানে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্যে ছিল আরাকানে একটি স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাজ্য গঠন করা।

১৯৪৭ সালে বার্মার পার্লামেন্টে মেম্বার নির্বাচিত হন দুই জন রোহিঙ্গা মুসলমান এমএ গাফফার এবং সুলতান আহমাদ। ১৯৫১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হন ৫ জন রোহিঙ্গা। ১৯৫৬ সালেও নির্বাচিত হন অনুরূপ ৬ জন রোহিঙ্গা এবং সুলতান আহমাদ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োজিত হন।

১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন একটি সেনা ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন এবং মুসলমানদের অধিকারসমূহ একে একে হরণ করতে শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ সেনাবাহিনী থেকে সকল মুসলমানকে অপসারণ করা হয়। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রুদ্ধ করে নানা উৎপীড়নমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়। মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে পর্যন্ত সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাখাইন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আকিয়াবে আমরণ অনশন করে সরকারকে চাপ দিতে থাকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। তারা অভিযোগ তোলে যে আরাকানে মুসলমানরা দিন দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে এবং অচিরেই তারা সমগ্র আরাকান দখল করে ফেলবে। তারা অভিযোগ তোলে যে, এর পিছনে দায়ী হ'ল বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসীরা। এর ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালে বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের উপর 'অপারেশন কিং ড্রাগন' নামে ভয়াবহ আর্মী অভিযান চালায়। ফলে ২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পরে জাতিসংঘের সহযোগিতায় তারা বছরখানেক পর পুনরায় আরাকানে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার আগেই শরণার্থী শিবিরে অপুষ্টির শিকার হয়ে প্রায় ১২ হাযার মানুষের মৃত্যু ঘটে। যার অধিকাংশই ছিল শিশু।

কিছুকাল পরই ১৯৮২ সালে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে অবৈধ অভিবাসী বাঙালী বলে অভিহিত করা হয়। ফলে তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে পড়ে। তাদের চলাফেরা সীমিত করে দেয়া হয়। লেখাপড়া, চাকুরি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের জমিজমা জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে বৌদ্ধ বসতিস্থাপনকারীদের দেয়া হয়। যেন তারা ক্ষুধার্ত বিড়ালের সম্মুখে খাঁচায় বন্দী ইঁদুর।

১৯৮৯ সালে আরাকানের নাম পরিবর্তন করে রাখাইন রাখা হয়, যেন মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহ্যকে ইতিহাসের পাতা থেকে বিলুপ্ত করে রোহিঙ্গাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলা যায়।

১৯৯২ সালে পুনরায় ব্যাপকভাবে মিলিটারী অপারেশন শুরু হ'লে আড়াই লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সেসময় চরম মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হয় রোহিঙ্গারা।

১৯৯৪ সাল থেকে নতুন জন্ম নেয়া রোহিঙ্গা শিশুদের জন্মসনদ দেয়া বন্ধ করে দেয় বর্মী সরকার।

২০১২ সালে আবারও রোহিঙ্গা ও রাখাইন দাঙ্গায় শতাধিক মুসলমান নিহত হয় এবং গৃহহীন হয় প্রায় দেড় লক্ষ। এ দাঙ্গায় নারী ধর্ষণ, ঘরবাড়ী ও ফসল পোড়ানো, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ ধ্বংসসহ বহু মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয় বর্মী সেনা এবং তাদের মদদপুষ্ট বৌদ্ধ জঙ্গীরা। এসময় বহু রোহিঙ্গা বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অসহায়, পাশবিক নির্যাতনের শিকার বনু আদমদেরকে সীমান্তরক্ষীদের পুশব্যাক করার নির্মম দৃশ্য সেসময় সারাবিশ্বের মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়। পরে এদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাগরে ডুবে মারা যায় অথবা সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে বেঘোরে প্রাণ হারায়। তবুও থেমে থাকেনি তাদের বিপদ সংকুল যাত্রা। বিভিন্ন দেশে তারা আশ্রয়প্রার্থী হয়। বাংলাদেশেও প্রায় ৭০ হাযার রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয় এ দফায়। যদিও শরণার্থীর মর্যাদা না পাওয়ায় তাদেরকে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

২০১৪ সালের আদমশুমারী থেকে বাদ দেয়া হয় রোহিঙ্গাদেরকে।

২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত থেমে থেমে রোহিঙ্গাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও আক্রমণ অব্যাহতভাবে চলছিলই। ২০১৬ সালের অক্টোবরে তথাকথিত 'হারাকাতুল ইয়াক্বীন' নামক একটি রোহিঙ্গা সশস্ত্র গ্রুপের পাল্টা আক্রমণে ৯জন পুলিশ নিহত হওয়ার ছুতো ধরে আবারও বর্মী সেনারা ভয়াবহ হামলা চালায়। তারা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। নৃশংসভাবে দা, ছুরি, কিরিচ, গুলির আঘাতে মারা যায় হাযার হাযার রোহিঙ্গা। গণধর্ষণের শিকার হয় হাযারও নারী। আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় বহু শিশুকে। রোহিঙ্গাদের শস্যক্ষেত, মার্কেট, মসজিদ, স্কুল সবকিছু পুড়িয়ে দেয় তারা। মর্মান্তিক গণহত্যার সেসব দৃশ্য বিশ্বমিডিয়ায় প্রকাশ পেলে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে। কিন্তু তাতেও নিরস্ত হয়নি বর্মী সরকার এবং বর্বর বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা। এ দফায়ও লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

২০১৭ সালের ২৪শে আগস্ট কফি আনান কমিশন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের সুফারিশ উত্থাপন করে মায়ানমার সরকারের কাছে। ঠিক তার পরদিনই ২৫শে আগস্ট রহস্যজনকভাবে 'আরাকান স্যালভ্যাশন আর্মী' নামে একটি গ্রুপ দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাতের আঁধারে ৩০টি পুলিশ স্টেশনে একযোগে হামলা চালিয়েছে বলে বর্মী সরকার জানায়। এই হামলার পূর্বাপর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে এটাই পরিষ্কার ধারণা হয় যে, এটি বর্মী সেনাবাহিনীর সাজানো পূর্বপরিকল্পনা। কেননা নাগরিকত্ব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবার সম্ভবনা যখন তৈরী হ'ল, ঠিক সেই সময় এমন হামলার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। যাইহোক সেই সূত্রকে ভিত্তিভূমি ধরে বর্মী সেনাবাহিনী নতুনভাবে জাতিগত সন্ত্রাসের বর্বরতম নযীর স্থাপন করে আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের চূড়ান্তভাবে নির্মূলের মিশনে নামে। সে অপারেশন আজও অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ২১০টি গ্রাম। বরাবরের মত মানবতাবিরোধী হেন কোন জঘণ্য অপরাধ নেই যা তারা করেনি। প্রায় ১০ হাযার রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে তাদের হাতে নিহত হয়েছে। আর কত নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে, কত শিশু পরিবার ছাড়া হয়েছে, কত নারী স্বামীহারা হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে প্রায় ৬ লাখ শরণার্থী। প্রতিদিন বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে রেকর্ডসংখ্যক প্রায় ২০ হাযার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করছে, যার প্রায় ৮০ ভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া অপেক্ষায় রয়েছে আরও কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা। জাতিসংঘ আশংকা করছে, এ দফায় শরণার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ রোহিঙ্গা জাতি মিয়ানমার থেকে সবংশে নির্মূলের পথে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের মূল কারণ :

(১) মুসলিম বিদ্বেষ : মায়ানমারের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ বৌদ্ধ। তারা বহুদিন ধরে মুসলমানদেরকে তাদের জাতিস্বত্তার জন্য হুমকি মনে করে আসছে। ফলে প্রায়ই বিচ্ছিন্নভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ ঘটে। যেমন ১৯৯৭ সালে মান্দালয়ে প্রায় দেড় হাযার বৌদ্ধ ভিক্ষু একত্রিত হয়ে মুসলমানদের মসজিদ, বাড়িঘর, গাড়ি, সহায়-সম্পদ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। যা রাজধানী ইয়াঙ্গুনসহ পার্শ্ববর্তী যেলাসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে কেবল মান্দালয়ে পোড়ানো হয় ১৮টি মসজিদ। পোড়ানো হয় বহু কুরআনের কপি। ২০০১ সালে আফগানিস্তানের বামিয়ানে বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় টাউঙ্গু শহরে বৌদ্ধরা দুই শতাধিক মুসলমান হত্যা করে। পুড়িয়ে দেয় ১১টি মসজিদ এবং ৪০০ বাড়ি-ঘর। মসজিদে ছালাতরত অবস্থায় হত্যা করা হয় ২০জন মুছল্লীকে। ২০১৩ সালে মায়ানমারের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে ৯৬৯ নামে মুসলিমবিদ্বেষী একটি বৌদ্ধ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তারা সারা মিয়ানমারে মুসলিমভীতি ছড়িয়ে দেয় এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণের জন্য বৌদ্ধ সমাজকে উস্কানী দেয়। যার নেতৃত্বে ছিল আশিন ভিরাথু নামের এক ভিক্ষু। এর প্রেক্ষিতে দেশটির মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে আরও কোনঠাসা করে ফেলা হয়। ২০১৬ তে বৌদ্ধরা রাজধানী ইয়াঙ্গুনের নিকটবর্তী বাগো অঞ্চলে একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। তার পরপরই কাচিন রাজ্য এবং মধ্য মায়ানমারের একটি মসজিদে আগুন ধরানো হয়। এছাড়া বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনা তো রয়েছেই। মানবাধিকারকর্মী ও বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকের প্রেসিডেন্ট তুন খিন বলেন, 'রোহিঙ্গারা অনেক বছর ধরেই গণহত্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মিয়ানমারের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সহজ লক্ষ্য তারা। রোহিঙ্গারা একটি ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং তাদের চেহারা ও ধর্ম- দুই-ই ভিন্ন। সুতরাং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করা সহজ।'

(২) বার্মীজ জাতীয়তাবাদ : 'বার্মা কেবল বার্মিজদের জন্য' এই শ্লোগান তুলে বার্মিজদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল শত বছর পূর্বেই। সেই সর্বগ্রাসী জাতীয়বাদের কোপে কাটা পড়তে হচ্ছে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের, যাদেরকে তারা বাঙ্গালী বলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের এই জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসের শিকার সেখানকার কারেন, কাচিন, কোকাং প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী আরও কয়েকটি নৃগোষ্ঠীও, যদিও তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অঞ্চল ও জাতিগত বিভেদ ঘিরে কেন্দ্রের সাথে সব প্রদেশের কমবেশী সহিংসতা বিরাজ করছে মিয়ানমারে। তবে সেসব স্বাধীনতাকামীদের মত সহিংস আরাকানের রোহিঙ্গারা কখনই ছিল না। হয়ত দুর্বলতা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুতা বিবেচনায় রোহিঙ্গা মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে নযীরবিহীন নৃশংসতায় নিশ্চিহ্ন হবার পথে। বিশেষ করে আরাকানের বৌদ্ধরা সংখ্যালঘুতার ভয়ে আক্রান্ত। কেননা যদি শরণার্থী হয়ে পড়া ১০-১৫ লক্ষ রোহিঙ্গাকে দেশে ফেরানো হয়, তবে আরাকানের ৬৫ ভাগ জনসংখ্যা হবে রোহিঙ্গা মুসলমান। যা তাদের জন্য চরম শিরঃপীড়ার কারণ। এজন্য তারা বর্তমানে আরাকানে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদেরও জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য

২টির বেশী সন্তান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করেছে।

(৩) নাগরিকত্ব আইন : ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে নতুন ষড়যন্ত্র আঁটে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। তাদের প্রণীত ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন মোতাবেক মিয়ানমারের পূর্ণ নাগরিক হিসাবে কেবল তারাই স্বীকৃতি পাবে যাদের পূর্বপুরুষগণ ১৮২৩ সাল তথা বৃটিশ শাসনের পূর্ব থেকে বার্মায় বসবাস করছে। এই আইনের ভিত্তিতে তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে তাদেরকে অবৈধ অভিবাসী আখ্যা দেয়। তাদের দাবী রোহিঙ্গারা বৃটিশ আমলে বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসী। তারা মিয়ানমারের আদিবাসী নয়।

(৪) বর্ণবাদ : ২০০৯ সালে হংকঙে মিয়ানমারের প্রতিনিধি ইয়ে মিন্ট অং রোহিঙ্গাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ না করার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, তারা হ'ল 'as ugly as ogres' অর্থাৎ 'রাক্ষসের মত কুৎসিৎ' এবং তারা অন্যান্য বার্মিজ নৃগোষ্ঠীর মত সুন্দর ও নরম চামড়ার অধিকারী নয়। এছাড়া এক আর্মী জেনারেল রোহিঙ্গা নারী ধর্ষণের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে এই ভাষা ব্যবহার করে যে, 'তারা কুৎসিৎ ও নোংরা। তাদেরকে কোন সেনা ধর্ষণ করবে না'।

(৫) অর্থনৈতিক স্বার্থ : খনিজ সম্পদ, সমুদ্রসীমা ও বিখ্যাত আকিয়াব বন্দর সুবিধার বিবেচনায় রাখাইন প্রদেশের গুরুত্ব অন্য রকম। এর দখল ঘিরে নানা শক্তির আশা-আকাঙ্খা এতকাল ধরে জিইয়ে থাকা সংঘাতের অন্যতম কারণ।

কেন মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের 'বাঙ্গালী' বলছে?

ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের পূর্বে ইংরেজরা বার্মার ১৩৯টি জাতিগোষ্ঠীর একটি তালিকা তৈরী করে। কিন্তু রোহিঙ্গার নাম সেখানে তারা অন্তর্ভুক্ত করেনি। এটি ছিল বার্মায় অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান রাখার লক্ষ্যে ব্রিটিশদের একটি রাজনৈতিক চাল *(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২শে সেপ্টেম্বর'১৭)*। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা নামক কোন জাতিগোষ্ঠী কখনই রাখাইনে ছিল না বলে দাবী করে বসে। তাদের মতে, রোহিঙ্গারা মূলত বাঙালী। তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে এসে রাখাইনে বসবাস করছে। কেননা তাদের ভাষা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে মেলে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর'১৭ মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইয়াং আবারও জোর দিয়ে বলেছেন, তারা রোহিঙ্গা হিসাবে স্বীকৃতি দাবী করছে অথচ তারা কখনো মিয়ানমারের নৃগোষ্ঠী ছিল না। এটি 'বাঙালী' ইস্যু। আর এই সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন *(প্রথম আলো, ১৮ই সেপ্টেম্বর'১৭)*।

অথচ আরাকানে রোহিঙ্গাদের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। তারাই হ'ল আরাকানের ভূমিপুত্র, যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এমনকি যে নাগরিকত্ব আইনে বৃটিশ শাসনের পূর্বকালকে নাগরিকত্ব পাবার শর্ত হিসাবে ধরা হয়েছে তার পূর্বেই ১৭৯৯ সালে স্কটিশ লেখক ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন আরাকানের স্থানীয় অধিবাসীদের কথা লিখতে গিয়ে বলেন, "Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arakan" অর্থাৎ 'আরাকানে বহুদিন ধরে বসবাস করে আসছে মুসলমানরা এবং তারা নিজেদেরকে রোহিঙ্গা বা আরাকানের অধিকাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন।' অনুরূপভাবে ১৮১১ সালে ক্লাসিকাল জার্নালে এবং ১৮১৫ সালে জার্মান লেখক জোহান সেভেরিন ভাটের এক জার্মান পত্রিকায় বার্মায় রোহিঙ্গা নামক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা লিখেছেন *(Azeem Ibrahim. The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide. Oxford University Press. pp. 24–25)*.

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত রোহিঙ্গারা আরাকানেরই আদিবাসী। বরং বৌদ্ধরা পরবর্তীতে বসতি স্থাপন করেছে। তারা নিজেদেরকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে আগমনকারী হিসাবে দাবী করলেও এর কোনই ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। বরং এটাই প্রমাণিত যে ১৫ শতকে স্বল্প সংখ্যায় আরাকানে প্রবেশ করলেও মূলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বার্মীজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর তারা ব্যাপক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। এজন্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন যথার্থই বলেছেন, 'রোহিঙ্গারা বার্মাতে যায়নি বরং বর্মীরা আরাকান দখল করেছে'।

মায়ানমারের বৌদ্ধ বংশদ্ভূত রোহিঙ্গা গবেষক ১৯৮৮ সালে মায়ানমার ত্যাগ করা ড. মঙ জার্নির বিশ্বব্যাপী অগণিত উপস্থাপনা অনুযায়ী, নিকটবর্তী চট্টগ্রাম এলাকার বাংলাভাষীদের সঙ্গে ভাষাগত মিলের সূত্র ধরে রোহিঙ্গাদের বাঙালী বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা আসলে গোয়েবলসের পুনঃপুনঃ মিথ্যা উচ্চারণের মাধ্যমে তাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠার সফল এক মায়ানমার সরকারী অপচেষ্টা।

তাছাড়া ভাষা বাংলা হ'লেই যদি বাংলাদেশী হয়, তাহ'লে আসাম, ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সব বাঙালী বাংলাদেশী হ'ত! অনুরূপভাবে তারা যদি বাংলাদেশীই হ'ত তাহ'লে শত বছর ধরে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েও তারা কেন আরাকানে অভিবাসী হয়ে পড়ে থাকবে?

মায়ানমারের অন্যান্য স্থানে মুসলমানদের কি অবস্থা?

মায়ানমারে রোহিঙ্গা ছাড়াও ইন্ডিয়ান বংশদ্ভূত মুসলমান রয়েছে যারা ইয়াঙ্গুনে বসবাস করে আসছে। এছাড়া রয়েছে চায়না এবং মালয়ী বংশদ্ভূত মুসলমান। রয়েছে বার্মীজ নারীদের সাথে বিবাহসূত্রে স্থায়ী হওয়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরাও। এদের সংখ্যা চার লাখের বেশী নয় *(২০১৫ সালে মিয়ানমার সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)* এবং বৌদ্ধদের সাথে একত্রিতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে সাধারণতঃ তারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয় না। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন আক্রমণে তাদেরকেও কোনঠাসা করে রাখা হয়। এছাড়া একমাত্র রাখাইনের 'কেমান' মুসলমানরা মিয়ানমারের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা বৃটিশপূর্ব কাল থেকেই জাতিগতভাবে রোহিঙ্গাদের প্রতি বিদ্বেষী এবং আরাকানে রোহিঙ্গাদের আধিপত্য বিস্তারকে বিরূপ চোখে দেখে। তাদের সংখ্যাও মাত্র ৩ হাযারের মত। এ কারণে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা স্বীকৃতি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

Contents

কেন হচ্ছে না সমাধান?

রোহিঙ্গারা গত অর্ধশত বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে জাতিগত সন্ত্রাসের শিকার। তাদের ব্যাপারে মিয়ানমার সরকার মানবাধিকার লংঘনের সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করেছে। এতদস্বত্ত্বেও গোটা বিশ্ব কেন নিশ্চুপ কিংবা যতটা জোরালো ভূমিকা নেয়া দরকার, তা নিচ্ছে না কেন? এর প্রাথমিক উত্তর রোহিঙ্গারা মুসলমান। ফলে স্বাভাবিক মানবাধিকার যেন তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার আজকের বিশ্বে। অপরদিকে নতজানু মুসলিম সরকারগুলোও আপন আপন স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে তারাও রোহিঙ্গাদের অধিকারের প্রশ্নে সরব নয়। দ্বিতীয়তঃ অমেরিকা, ইংল্যাণ্ড আর জাতিসংঘের ভূমিকা একসূত্রে গাঁথা; যার স্বার্থ ইঙ্গ-মাকিন পরাশক্তির অর্থনৈতিক ঔপনিবেশবাদ। চীন, রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকাও এখানে ঘৃণ্য বাণিজ্যিক আধিপত্যবাদকে ঘিরেই। ফলে কেউই রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সাহায্য ঘোষণার বাইরে কোন পদক্ষেপ নেবে না। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থকে পাশ কাটিয়ে মানবতার স্বার্থ বিবেচনার মত সত্য অবস্থানে আসার সৎসাহস নেই তাদের। বাংলাদেশ সরকারেরও সাধ্য নেই যে উপরোক্ত পরাশক্তিদের রাগিয়ে কোন কথা বলে। ফলে মায়ানমারের গণহত্যার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব তোলার দুঃসাহস তাদের হয়নি। সুতরাং রোহিঙ্গা সমস্যার আশু সমাধান যে সুদূর পরাহত, তা বলাই বাহুল্য। পোপ ফ্রান্সিস যথার্থই বলেছিলেন, ‘এই বিশ্বের মুসলিম দুই প্রকার যুদ্ধ করছে- প্রথম যুদ্ধ নিজেদের পীড়িত প্রমাণ করার, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিচার পাওয়ার। প্রথম যুদ্ধে তারা কিছু হ’লেও এগিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে আজ পর্যন্ত তারা সাফল্য লাভ করতে পারেনি।’ ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, সিরিয়া, মিয়ানমার, ইরাকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যা করা হচ্ছে, অথচ উল্টো মুসলমানদেরকেই বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী!

সমাধানের পথঃ

আজও পর্যন্ত রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হিসাবে রোহিঙ্গাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার নিশ্চিত করার পরিবর্তে বৈশ্বিক সংস্থাগুলো কেবল মানবিক বিপর্যয় ঠেকানোতে আগ্রহ দেখায়। ফলে মূল সমস্যাগুলো অবহেলিতই থেকে যায়। এতে করে বর্মী সরকার বারবার নৃশংস নিপীড়ন চালানো সত্ত্বেও এবং গণহত্যার সমস্ত উপাদানের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এক্ষণে এর সমাধান বাংলাদেশের হাতেই রয়েছে বলে আমরা মনে করি। কেননা বেশী দিন এত শরণার্থীর বোঝা বহন করা তার জন্য দুরূহ হবে। সেজন্য রোহিঙ্গাদের পক্ষে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাই হবে সবচেয়ে ফলপ্রসূ এবং সম্ভবত খোদ রোহিঙ্গাদের চেয়েও তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মানবিক অবস্থান সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। একে পুঁজি করে সরকারের সামনে সুযোগ এসেছে আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের, যাতে করে মিয়ানমার সরকার কফি আনান কমিশনের সুফারিশ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয় এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে সসম্মানে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নেয়। এছাড়াও সরকার মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নারকীয় গণহত্যার বিচার দাবী করে আন্তর্জাতিক আদালতে (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট) অভিযোগ উত্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপই যদি ফলপ্রসূ না হয়, সেক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদেরকে শরণার্থী ক্যাম্পের মানবেতর জীবনে বন্দী না রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনবিরল এলাকায় পুনর্বাসিত করা যেতে পারে। এতে করে তারা একদিকে যেমন দেশীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধশক্তি হিসাবেও কাজ করতে পারবে। যেমনটি প্রস্তাব করেছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব *(সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০১২)*।

মোটকথা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়দাতা দেশ এবং প্রতিবেশী হিসাবে বাংলাদেশের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখার সুযোগ এসেছে। যা কিনা মানবতার পক্ষে এবং বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা হিসাবে বিবেচিত হ’তে পারে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকটে আকুল প্রার্থনা তিনি যেন এই মযলুম ভাইবোনদের রক্ষা করেন এবং যালিমদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করেন। সেই সাথে যে সকল শরণার্থী মুহাজির বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রতি সরকার মানবতার দৃষ্টি আরও প্রসারিত করুক এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ সাধ্যমত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তাদের প্রতি এগিয়ে আসুক, এটাই আমাদের কাম্য।

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com নিয়মিত প্রকাশনার ২০ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৮
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৮

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

টেকনাফের পথে-ঘাটে মানবতার করুণ আর্তনাদ!

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের ইতিহাস অত্যন্ত ভয়াবহ, লোমহর্ষক, সর্বাধিক বেদনার ও চরম নিষ্ঠুরতার। এ ইতিহাস বিগত সকল নির্যাতন-নিপীড়নের রেকর্ড ভঙ্গের ইতিহাস। দূর অতীতের যালেম শাসক ফির'আউন, নমরূদদের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানিয়েছে রক্তচোষা অংসানসুচির সরকার। হাযার হাযার মুসলিম নর-নারীকে যবাই করে হত্যা, গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করা, নারীদের উপর বর্বরোচিত পাশবিক নির্যাতন, জীবন্ত মানুষকে জলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে মর্মান্তিকভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা, সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে উল্লাসে মত্ত হওয়া এবং একপর্যায়ে তাকে হত্যা করা, এমনকি জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়া নিরীহ মানুষগুলোকে পিছন থেকে গুলি অথবা কুপিয়ে হত্যার মত পৈশাচিক ও শাসরুদ্ধকর ঘটনা এখন আরাকান জনপদের নিত্যদিনের ঘটনা।

গত বছরের ৯ অক্টোবর থেকে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ইতিহাসের বর্বরোচিত নির্যাতন শুরু হ'লে হাযার হাযার নিরীহ মুসলিম নর-নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেক-বার্মার সীমান্তবর্তী নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার যেলার টেকনাফে আশ্রয় নেয়। তখন থেকেই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে সেখানে ত্রাণ কর্মসূচী শুরু হয়, যা অদ্যাবধি চলমান আছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

সম্প্রতি গত ২৪ শে আগষ্ট হ'তে নতুন করে সহিংসতা শুরু হ'লে ঘটনার তীব্রতা ও রূঢ় বস্তবতায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী আরও জোরদার করা হয়। এ উপলক্ষে গত ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার যেলার টেকনাফ ও উখিয়া সফর করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই সফরে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। আলোচ্য নিবন্ধে পাঠকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত সফরের সরেযমীন প্রতিবেদন তুলে ধরা হ'ল।-

৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার: আগের দিন রাজশাহী হ'তে ঢাকা অতঃপর ঢাকা থেকে অদ্য বেলা সাড়ে ১১-টায় কক্সবাজার পৌঁছে নগরীর পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ মাওলানা নাজমুল হকের নিজস্ব তত্তাবধানে তাঁর বাড়ী সংলগ্ন নব নির্মিত এই পাঁচতলা ফাউণ্ডেশনের এক তলা সম্পন্ন মসজিদটিই কক্সবাজার শহরের প্রথম কোন পূর্ণাঙ্গ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। এই মসজিদটিই এখন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু। আমীরে জামা'আত প্রথমবারের মত এখানে খুৎবা দিলেন। কক্সবাজার শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উখিয়া, টেকনাফ এবং চকরিয়া ও সাতকানিয়া থেকেও 'আন্দোলন'-এর কর্মী ও সুধীজন আমীরে জামা'আতের খুৎবা শুনার জন্য জুম'আয় উপস্থিত হন। জুম'আর ছালাত শেষে যেলা সভাপতির বাসায় দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ সম্পন্ন হ'ল।

অপরদিকে যেলা সেক্রেটারী মুজীবর রহমান ভাইয়ের নেতৃত্বে তার বাসায় চলতে থাকে ত্রাণের প্যাকেট তৈরির কাজ। অনেক রাত পর্যন্ত কর্মীরা প্যাকেট তৈরীতে ব্যস্ত থাকেন। ২০টি আইটেমের প্যাকেট, তাই সময় লাগে প্রচুর। আইটেম গুলোও আগত শরণার্থীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতঃপর পূর্বে কৃত শিডিউল অনুযায়ী বাদ এশা পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ শেষে যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক এ্যাডভোকেট ফরীদ আহমাদের আমন্ত্রণে তার বাসায় রাতের আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে হোটেলে ফিরে আসলাম।

৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার: সকাল সাড়ে ৮-টায় বের হওয়ার কথা থাকলেও ট্রাক লোড করতে বেশ সময় লেগে গেল। ফলে সোয়া ১০-টায় যাত্রা শুরু হ'ল। গন্তব্য উখিয়া ও টেকনাফ। ২টি মাইক্রো ও ত্রাণ ভর্তি ১টি ট্রাক। সাথে নগদ টাকা নেওয়া হ'ল শরণার্থীদের জন্য। উখিয়া কলেজের পর থেকেই রাস্তার দু'ধারে খোলা আকাশের নীচে রোহিঙ্গাদের দেখা গেল। সামনেই কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প। আশপাশে অগণিত মানুষের ভীড়। গাড়ি এগিয়ে চলল হোয়াইক্যং বাযারের দিকে। পরের দৃশ্য আরও বেদনাবিধুর। যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই সদ্য আগত রোহিঙ্গা মুসলিম নারী-পুরুষের স্রোত। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে খোলা আকাশের নীচে কাদামাটিতে হাযার হাযার নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কোনরকমে ১২/১৪ ফুটের একটি পলিথিন টাঙ্গিয়ে তার নীচে পরিজন নিয়ে অবস্থান নিয়েছে, আর অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে কিছু প্রাপ্তির আশায়। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে শুধুই পলিথিনের ছাউনি ছোখে পড়ছে। ঠিক হজের সময়ে মিনা প্রান্তরের তাঁবুর মত। কেউ পাহাড় কেটে কিছুটা সমতল করে সেখানে ঘর বাঁধার কোশেশ করছে। কেউ পাহাড়ের পাদদেশে অথবা যে যেখানে পারছে অন্তত বসার একটু ব্যবস্থা করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। সাথীদের কাছে শুনতে পেলাম এক ফালি পলিথিন কিনতেই লাগছে ২/৩ শত টাকা। সেই সাথে লাগছে ২/৩টি বাঁশ। এইটুকু জোগাড়ে সামর্থবানরাই এভাবে ছাউনি দিয়ে কোনরকমে মাথা গুঁজার ব্যবস্থা করতে পারছে। এর বাইরে হাযার হাযার রোহিঙ্গা রাস্তা-ঘাটে পথে-প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সবচাইতে মর্মান্তিক হচ্ছে শিশু-কিশোরদের অবস্থা। এদের দূরবস্থা দেখে কারও চোখে পানি না এসে পারে না। অনাহারে-অর্ধাহারে, অযত্নে এদের জীবন একবারেই বিপন্ন। চোখে মুখে শুধুই শঙ্কার ছাপ।

আমরা আমাদের নির্ধারিত গন্তব্য হোয়াইক্যং বাযারের দিকে এগিয়ে চললাম। সেখানে সদ্য আগত রোহিঙ্গাদের একটি তালিকা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হবে। বেলা পৌনে ১-টায় সেখানে পৌঁছে নির্যাতিত রেহিঙ্গা মুসলিম নারী-পুরুষ ও স্থানীয় এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর পূর্বে কৃত তালিকা অনুযায়ী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হ'ল। এসময়ে আমীরে জামা'আত আবেগাপ্লুত ও ওজস্বিনী ভাষায় বিশ্বনেতৃবৃন্দের নিকটে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আহ্বান জানান।

কাঁদালেন যিনি : হোয়াইক্যংয়ে অনুষ্ঠানের শুরুতে আমীরে জামা'আত রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে একজনের তেলাওয়াত শুনতে চাইলেন। শঙ্কিত বদনে সামনে আসলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়াস, যিনি আরাকানের মংডু থানাধীন তেহেরীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং সেখানকার একটি জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব। সুললিত কণ্ঠে শুনালেন কুরআন তেলাওয়াত। ৭ সদস্যের পরিবারের ৫ জনকে হারিয়ে বেঁচে থাকা একমাত্র শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে তিনি এদেশে পালিয়ে এসেছেন। এরপর আমীরে জামা'আতের আহ্বানে নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলতে আসলেন সে দেশের মংডু থানার মেরুল্লা গ্রামের বশীর আহমাদ। স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় বর্মী সেনা ও মগ দস্যুদের বর্বরোচিত নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তার অঝোর কান্না ও করুণ বিবরণ শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। তিনি বললেন, *'আমাদের গ্রামে ৭ হাযার পরিবারে ২৩ হাযার লোকের বাস ছিল। বর্মী সেনারা ৩ সহস্রাধিক মানুষকে গুলি করে ও যবাই করে হত্যা করেছে। মা-বোনদের উপর চালিয়েছে অবর্ণনীয় পাশবিক নির্যাতন। ফলে আমরা গ্রাম খালি করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসি। এদেশে যখন পৌঁছি তখন আমাদের দেহে পোষাক ছিল না। পেটে খাদ্য ছিল না। বাংলাদেশী ভাইদের সাহায্যে আমরা সব পেয়েছি। এদেশের ভাই-বোনদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন'।*

লম্বা বিল পয়েন্ট: হোয়াইক্যং থেকে টেকনাফের দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর 'লম্বা বিল' পয়েন্ট। এই পথে নাফ নদী কিছুটা সরু হওয়ায় অনেক শরণার্থী এই পথটিকে বেছে নেয়। 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কিছুদিন যাবত এই পথে আগত রোহিঙ্গাদের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। আমীরে জামা'আত এখানে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে কর্মীদের মাধ্যমে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে টেকনাফ যাওয়ার পথে নাফ নদী পেরিয়ে সদ্য আগতদের সারির মাঝে পরিবার ও ব্যক্তি বুঝে ৫০০, ১০০০ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। অতঃপর টেকনাফের ডা. নূরুল ইসলাম যিনি ইতিমধ্যে ২০ কপি 'আত-তাহরীকে'র এজেন্ট তার বাসায় দুপুরের খাবার গ্রহণ করি। অতঃপর সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিদায় হয়ে মেরিন ড্রাইভ সড়ক দিয়ে রাত ৮-টার দিকে কক্সবাজার ফিরে আসি। ফেরার পথে সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। কক্সবাজার পৌঁছে 'আন্দোলন'-এর সুধী এ্যাডভোকেট ছিদ্দীকুর রহমানের বাসায় রাতের খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচী শেষ হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার: পূর্ব শিডিউল অনুযায়ী আজ চট্টগ্রামে সুধী সমাবেশ ও যেলা কমিটি পুনর্গঠন। আমীরে জামা'আত সহ দু'জনের বাসের টিকেটও কাটা হয়েছে আগেই। কিন্তু মনকে বুঝাতে পারছি না। আরও দু'একদিন অসহায় এই মানুষগুলোকে সেবা দিতে পারলে হয়তো কিছুটা তৃপ্তি পেতাম। আমীরে জামা'আতের নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর থেকে গেলাম। এদিকে সুধী সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামকে সাথে নিয়ে আমীরে জামা'আত সকাল সাড়ে ৯-টার বাসে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

'আন্দোলন'-এর যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে রওয়ানা হ'লাম টেকনাফের উদ্দেশ্যে। গতদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১০০০ ও ৫০০ টাকার নোটগুলোকে ১০০ টাকার নোটে রূপান্তরের জন্য শহরের সিটি ব্যাংকে গেলাম। সেখানে কর্মরত আবুল কালাম আযাদ ভাই সব ব্যবস্থা করে দিলেন এবং ম্যানেজারের নিকট থেকে ছুটি নিয়ে তিনি নিজেও আমাদের সাথী হ'লেন। টাকা খুচরা করা হ'ল এ জন্য যে, রোহিঙ্গারা এদেশের টাকার মান বুঝে না। সেকারণ অনেকে প্রতারক চক্রের হাতে পড়তে পারে। তাছাড়া ছোটখাট জিনিস কিনতে গেলে বড় নোট নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। সেকারণ পরিমাণ যাই দেওয়া হোক, নোট ছোট হওয়া ভাল। যদিও দাতাদের জন্য এটি কিছুটা কষ্টের। এসময়ে ব্যাংকে দেখা হ'ল দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের বড় ভাই দিদারুল ইসলামের সাথে। গতকাল তারা গিয়েছিলেন টেকনাফের থাইংখালী, পালংখালী ও উলুবুনিয়া পয়েন্টে। সীমান্তের একেবারে সন্নিকটে। সেখানে গিয়ে দেখতে পান সারিবদ্ধ লাশ। কারো পিছনে গুলি, কারো মাথায়। কারো চাপাতির কোপে মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে মগজ বের হয়ে আছে। তিনি একটি ভিডিও চিত্র দেখালেন। যা দ্বিতীয় বার দেখা অসম্ভব।

এরপর সাথীদের নিয়ে আগের দিনের ন্যায় উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন পয়েন্টে দিনব্যাপী নগদ অর্থ ও কিছু খাদ্যবস্তু বিতরণ করা হ'ল। বিশেষ করে হোয়াইক্যং বাযার থেকে টেকনাফের দিকে কিছু দূর গিয়ে তুলাতুলি নামক স্থানে দাঁড়িয়ে পিকআপ, ট্রাক, অটো, সিএনজি যোগে সীমান্ত হ'তে ক্যাম্পের দিকে আগত রোহিঙ্গাদের মধ্যে গাড়ী দাঁড় করিয়ে নগদ অর্থ ও খাবার বিতরণ করা হ'ল। এভাবে দিনের কর্মসূচী শেষে সন্ধ্যা ৭-টায় কক্সবাজার পৌঁছে রাত সাড়ে ৮-টার বাসে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত ১-টায় সেখানে পৌঁছি। অতঃপর চারদিনের সফর শেষে পরদিন ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার আমীরে জামা'আতের সাথে চট্টগ্রাম হ'তে ঢাকা, অতঃপর ঢাকা হ'তে রাজশাহী ফিরে আসি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

Contents

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা : মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম, মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, মুনাযির (তার্কিক), বাগ্মী, সাংবাদিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সুদক্ষ অনুবাদক। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রতিরক্ষায় তিনি এক অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। তাক্বলীদের বেড়াজালে আবেষ্টিত মুসলিম সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আত ও মাযহাবী গোঁড়ামি বিদূরিতকরণে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল দারুণ কার্যকর। তাঁর সম্পাদিত 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকা সমাজ সংস্কারে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড়শ'। তাফসীর ইবনে কাছীর ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ (রহঃ)-এর অমর গ্রন্থ 'ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন'-এর উর্দূ অনুবাদ এবং পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'খুৎবাতে মুহাম্মাদী' তাঁর এক অনন্য ইলমী অবদান। নিম্নে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

জন্ম ও বংশ পরিচয় : মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী বর্তমান গুজরাট (সাবেক মুম্বাই) প্রদেশের কাঠিয়াওয়াড় (বর্তমানে সও রাষ্ট্র) যেলার জুনাগড় শহরে ১৩০৭ হিঃ/১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবরাহীম ধনাঢ্য ফল ব্যবসায়ী ছিলেন। মাতার নাম বিবি হাওয়া। পিতা-মাতা দু'জনই বিখ্যাত মায়মান (প্রচলিত মেমন) বংশোদ্ভূত ছিলেন।[১] উল্লেখ্য যে, মায়মান সম্প্রদায় মূলতঃ সিন্ধুর অধিবাসী ছিল। সাইয়িদ ইউসুফুদ্দীন নামক জনৈক মুবাল্লিগের হাতে এরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর বাগদাদ থেকে ১৪২২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে আসেন। তাঁর দশ বছরের অবিশ্রান্ত দাওয়াতের ফলে 'লোহানা' (Lohana) গোত্রের ৭০০ পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে।[২] গুজরাট বিজয়ী মোগল বাদশাহ আকবরের পূর্বে আহমদাবাদের মুযাফফর শাহী যুগে মায়মান সম্প্রদায় সিন্ধু থেকে কাঠিয়াওয়াড়ে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত লোহানা গোত্রেরই একটি শাখা মায়মান।[৩]

জুনাগড়ীর পিতা নিজেকে মুহাম্মাদী তথা আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচয় দিতে পসন্দ করতেন। এজন্য মুরব্বী ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে তাঁকে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তার ঔরসে তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এরা হলেন ইসমাঈল, আয়েশা খাতুন, মুহাম্মাদ এবং আব্দুস সোবহান।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা ও বিবাহ : জুনাগড়ীর স্বীয় জন্মভূমি জুনাগড়ে আহলেহাদীছ আলেম আব্দুল্লাহ জুনাগড়ীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[৫] যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই আমেনা নামে এক পুণ্যবতী মহিলার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর মধ্যে পড়াশোনার ব্যাপারে কোন আগ্রহ না দেখে পিতা তাঁকে আতর বিক্রির ব্যবসায় নিয়োজিত করেন। তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে এ ব্যবসা চালিয়ে যান। বিয়ের পর স্ত্রীর কোলজুড়ে এক ফুটফুটে শিশুর জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের কিছুদিন পরেই দাম্পত্য জীবনের প্রথম ফসলের মৃত্যু ঘটে। এরপর দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের সময় প্রিয়তমা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। জীবনসঙ্গিনীর আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সদ্য পরলোকগত স্ত্রীর মধুর স্মৃতি তাঁর মানসপটে জ্বলজ্বল ছিল। তিনি তাকে কোনমতেই ভুলতে পারছিলেন না। স্ত্রীর চিন্তায় সবসময় মনমরা হয়ে থাকতেন। এজন্য তাঁকে পরিবারের সদস্যদের টিটকারি ও ভ্রুকুটি সহ্য করতে হত।[৬]

জ্ঞানান্বেষণে দিল্লীর পানে : দুর্বিষহ এই মানসিক অবস্থায় জুনাগড়ে মোটেই তাঁর মন বসছিল না। উপরন্তু বাল্য শিক্ষক আব্দুল্লাহ জুনাগড়ীর নিকট থেকে দিল্লীতে উচ্চশিক্ষার বিবরণ শুনে তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য স্বপ্নের জাল বুনতে থাকেন। কিন্তু পিতা এতে মোটেই সম্মত হচ্ছিলেন না। জুনাগড়ীও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এজন্য যিদ ধরলে পিতা তাঁকে খরচ না দেয়ার ধমকি দেন। অবশেষে পরিবার-পরিজন ও জন্মভূমির মায়া ত্যাগ এবং সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষার উদগ্র বাসনায় তিনি বন্ধু আব্দুস সালামের[৭] সাথে ১৯১৩ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে একদিন সকালে সংগোপনে দিল্লীর পানে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে তিনি 'মাদরাসা আমীনিয়া'তে ভর্তি হন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে জ্ঞানচর্চার ব্রতী হন। এটি দেওবন্দীদের প্রতিষ্ঠিত একটি কট্টর হানাফী মাদরাসা ছিল। স্বাধীন চিন্তা-চেতনা পোষণ এবং ইজতিহাদের কোন জায়গা সেখানে ছিল না। বরং আপাদমস্তক তাক্বলীদে শাখছীর জরাগ্রস্ততায় জর্জরিত ছিল। তাই আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে তাঁকে মাদরাসা থেকে বের করে দেয়া হয়।[৮]

ঐদিন ফতেহপুরী মসজিদে তিনি মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। ছালাতে তিনি এবং আরেকজন মুছল্লী সশব্দে আমীন বলেন। ছালাত শেষে তাঁর সাথে আলাপচারিতায় মাওলানা

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পশ্চিম পাকিস্তান : মারকাযী জমঈয়তে তুলাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ১৭৪; আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুল মুহাম্মাদিইয়ীন (সারগোদা : মাকতাবা ছানাইয়াহ, ২০১২), পৃঃ ৮৩; ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) : হায়াত ওয়া খিদমাত, উর্দূ অনুবাদ : আব্দুল্লাহ সালাফী মুর্শিদাবাদী (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ১৯৯৫), পৃঃ ১৬।*

২. *T.W. Arnold, The Preaching of Islam (London : Constable and Company Ltd. 2nd edition, 1913), P. 207, Chap. IX, The Spread of Islam In India.*

৩. *আল্লামা আব্দুল আযীয মায়মানী, বুহূছ ওয়া তাহকীকাত, সংকলনে : মুহাম্মাদ উযাইর শামস (বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৫), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮; মুহাম্মাদ রাশেদ শায়খ, আল্লামা আব্দুল আযীয মায়মান সাওয়ানিহ আওর ইলমী খিদমাত (করাচী : কিরতাস, অক্টোবর ২০১১), পৃঃ ৩৩-৩৪।*

৪. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী : হায়াত ওয়া খিদমাত, পৃঃ ১৬-১৭।*

৫. *তারাজিম, পৃঃ ১৭৪।*

৬. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ১৭-১৮।*

৭. *জুনাগড়ীর একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম মায়মান জুনাগড়ীর প্রদত্ত তথ্য মতে বিশ্ববরেণ্য আরবীবিদ আল্লামা আব্দুল আযীয মায়মানীর সাথে তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন। তথ্য : মাওলানা সেলিম মায়মান জুনাগড়ী (৭৭), মির্জাপুর, বিনোদপুর, মতিহার, রাজশাহী। তাং ১৫.০৯.১৭ইং।*

৮. *তারাজিম, পৃঃ ১৭৪-৭৫; মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ১৮-১৯।*

আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮৬৬-১৯৩৩) প্রতিষ্ঠিত দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসার সন্ধান পান। সেখানে ভর্তি হয়ে তিনি নিবিষ্টচিত্তে নাহু, ছরফ, তাফসীর ও হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং ফারেগ হন। পাশাপাশি দিল্লীর ফাটক হাবাশ খাঁ মাদরাসায় মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২) খ্যাতিমান ছাত্র, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রহীম গযনভী অমৃতসরী (মৃঃ ১৩৪২ হিঃ) ও মাওলানা আব্দুর রশীদের কাছে হাদীছের কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া দিল্লীর প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভী মানতেকী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়ূব পারেচার নিকট মানতেক, দর্শন, মুনাযারার মূলনীতি অধ্যয়ন করেন এবং এসব বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন।[৯]

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : লেখাপড়া শেষ করার পর মাওলানা জুনাগড়ী দিল্লীর আজমিরী গেট সন্নিকটস্থ আহলেহাদীছ মসজিদে পাঠদান শুরু করেন। এখানে তিনি 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়াহ' প্রতিষ্ঠা করেন। আমৃত্যু সুদীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ তিনি এ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের কুরআন ও হাদীছের দরস প্রদান করেন। অল্পদিনের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন জায়গার ছাত্ররা এখানে এসে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় ছাত্র মাওলানা সাইয়িদ তাকরীয আহমাদ সাহসোয়ানী এবং মাওলানা আব্দুর রশীদ এখানে দরসের সিলসিলা অব্যাহত রাখেন।[১০]

পত্রিকা প্রকাশ : মাদরাসা মুহাম্মাদিয়ায় পাঠদানের পাশাপাশি মাওলানা জুনাগড়ী দ্বীনে হকের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে 'গুলদাস্তায়ে মুহাম্মাদিয়া' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ১৩৪০হিঃ/১৯২১ সাল থেকে 'আখবারে মুহাম্মাদী' নামে প্রত্যেক আরবী মাসের ১৫ তারিখে পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৬ পৃষ্ঠার এ পত্রিকাটি দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারে এবং শিরক ও বিদ'আত-এর মূলোৎপাটনে দিশারীর ভূমিকা পালন করে। এতে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে মাযহাবীদের সমালোচনা এবং ইসলাম সম্পর্কে বিধর্মীদের অভিযোগ সমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হত। সমাজ সংস্কারে এ পত্রিকাটির অবদান অতুলনীয়।

মাওলানা জুনাগড়ী আমৃত্যু এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি দক্ষ হাতে বৈদগ্ধ ও একাগ্রতার সাথে আমৃত্যু এর সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণে ১৯৪১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা বের হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪১ সালের ১৫ই জুন থেকে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা সাইয়িদ তাকরীয আহমাদ সাহসোয়ানীর সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে ১৯৪৬ সালে আবার বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চালু হয়। কয়েক মাস চালু থাকার পর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।[১১]

দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীর সাথে জুনাগড়ীর সম্পর্ক : দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীর সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর গভীর সম্পর্ক ছিল। মাদরাসার অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা সেখানকার শিক্ষকরাই নিতেন। তাঁদের সাথে মাওলানা জুনাগড়ীও কখনো কখনো শরীক হতেন। মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শেখ আতাউর রহমান প্রত্যেক সপ্তাহে জুম'আর ছালাতের পরপরই মাদরাসায় গাড়ী (প্রাইভেট কার) পাঠাতেন। মাদরাসার সব শিক্ষক সেই গাড়ীতে চড়ে তাঁর বাড়ীতে দাওয়াত খেতে যেতেন। মাওলানা জুনাগড়ীও সম্মানিত মেহমান হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকতেন। আতাউর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর মেজো ছেলে শেখ আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর স্কন্ধে মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তখনও এ নিয়ম জারী ছিল। তবে মাওলানা জুনাগড়ী সে সময় তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হতেন না। তাঁর খাবার তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হত।

রহমানিয়া মাদরাসার নিয়ম-নীতি অত্যন্ত কঠোর ছিল। ফলে নিয়ম ভঙ্গকারী বহিষ্কৃত ছাত্রদের শেষ আশ্রয়স্থল হতেন মাওলানা জুনাগড়ী। তিনি তাঁর পত্রিকা অফিস সংলগ্ন রুমে তাদের খানাপিনার আয়োজন করতেন এবং তাদেরকে এত সুন্দরভাবে পাঠদান করতেন যেন মাদরাসার পরবর্তী পরীক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারে।[১২]

দাওয়াত ও তাবলীগ : 'খতীবে হিন্দ' খ্যাত[১৩] মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে এক সাহসী মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। নির্ভীকচিত্তে তিনি কুরআন-সুন্নাহ্র দাওয়াত জনসমাজে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তিনি বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ইউপি, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও কলকাতা ছিল তাঁর দাওয়াতের ক্ষেত্র। এসব অঞ্চলের বার্ষিক জালসাসমূহে উপস্থিত হয়ে তিনি মানুষকে তাওহীদ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের দাওয়াত দিতেন।[১৪] তিনি আজমিরী গেটের নিকটস্থ আহলেহাদীছ মসজিদে জুম'আর খুৎবা দিতেন। ওয়ায-নছীহতের জন্য নিকট দূরের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর মোহনীয় বাচনভঙ্গি, অগ্নিঝরা বক্তৃতা ও হৃদয়োৎসরিত দরদমাখা নছীহত শ্রোতাদের হৃদয়জগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। কুরআন ও সুন্নাহ্র আকর্ষণীয় বর্ণনা সমূহ, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ইসলামের ইতিহাস, ফের্কাবন্দী, তাক্বলীদ ও মাযহাবী গোঁড়ামির

৯. *তারাজিম, পৃঃ ১৭৫; মাওলানা মুহাম্মাদ মুক্তাদা আছারী উমারী, তাযকিরাতুল মুনাযিরীন (লাহোর : দারুন নাওয়াদির, ২০০৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১।*

১০. *মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সারগুযাশত (লাহোর : আল-মাকতাবাতুস সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ২০১২), পৃঃ ২৭; আব্দুর রশীদ ইরাকী, চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ (লাহোর : নু'মানী কুতুবখানা, তাবি), পৃঃ ১৫৭; মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ২৯।*

১১. *মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছিহাফাতী খিদমাত (বেনারস : আল-ইয্যাহ ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১৪), পৃঃ ২৮-২৯; তারাজিম, পৃঃ ১৭৫; মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ২৯-৩১।*

১২. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ২৭-২৮, ৩১-৩২।*

১৩. *আব্দুর রশীদ ইরাকী, বার্রে ছাগীর পাক ওয়া হিন্দ মেঁ ওলামায়ে আহলেহাদীছ কী তাফসীরী খিদমাত (ফায়ছালাবাদ : ছাদেক খলীল ইসলামিক লাইব্রেরী, জুলাই ২০০০), পৃঃ ৪৬।*

১৪. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন, ১/৩৭৩; মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আসলাম সায়ফ ফিরোযপুরী, তাহরীকে আহলেহাদীছ (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়াহ, ২০০৫), পৃঃ ৩৮৯।*

পরিণতি, তাওহীদ, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, সালাফে ছালেহীনের জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনা প্রভৃতি ছিল তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু। সমকালীন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে এসব বিষয় উপস্থাপনে তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[১৫]

মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায লিখেছেন, 'গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ছাড়া তিনি বাগ্মিতার ময়দানেও এক খ্যাতিমান সৈনিক ছিলেন। বাগ্মিতাশক্তির অবস্থা এই ছিল যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য পেশ করতেন এবং ক্লান্তির কোন লেশমাত্র থাকত না। তাওহীদ ও সুন্নাত বিষয়ে তাঁর বক্তব্যগুলি এমন হৃদয়গ্রাহী হত যে, শ্রোতামণ্ডলী গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করত। সর্বপ্রথম তিনি দিল্লীর আহলেহাদীছ কনফারেন্সের অধিবেশনে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন। জোরালো বক্তৃতা ও তারুণ্যের উদ্যমের নিদর্শন এই ছিল যে, তার ওযনের ভারে দুই তিনটি চেয়ার ভেঙ্গে যায়। অতঃপর বক্তৃতার ময়দানে এতটা প্রসিদ্ধ হন যে, দেশের পূর্ব-পশ্চিম যেখানেই কোন সাধারণ তাবলীগী জালসাও হত, শ্রোতামণ্ডলী অবশ্যই তাঁর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত'।

তিনি আরো লিখেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম তাঁর বক্তৃতা সমূহের ভূষণ ছিল। স্টেজ বা মিম্বরে আগমন করা মাত্রই মাসনূন খুৎবার পর আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানার জন্য এমন ঈমানোদ্দীপক এবং আকর্ষণীয় বাক্য বলতেন যে, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তা শুনত। স্বয়ং তাঁর নিজের উপর সে সময় আল্লাহপ্রেমে দেওয়ানা হওয়ার যে অবস্থা সৃষ্টি হত, তা কাগজের পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি আল্লাহপ্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং এমতাবস্থায় এমন সুন্দর সুন্দর শব্দগুচ্ছ মুখ থেকে নির্গত হত যেগুলিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামকৃত বলাই যুক্তিযুক্ত। ভারত ও পাকিস্তানের এমন হাযার হাযার মুসলমান এখনও জীবিত রয়েছে, যারা তাঁর জালসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল'।[১৬]

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর সাবেক আমীর মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী বলেন, 'খতীবে হিন্দ মুহাদ্দিছ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীকে আল্লাহ তা'আলা বক্তৃতার এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছিলেন যে, তিনি সব বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ, প্রামাণ্য ও প্রভাববিস্তারকারী বক্তব্য দিতেন। তাঁর কণ্ঠে এমন আকর্ষণ ও প্রভাব ছিল যে, মাসনূন খুৎবা শুরু করা মাত্রই শ্রোতাদের মনে ভাবাবেশের সৃষ্টি হত এবং অনেকে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে অঝোর নয়নে ক্রন্দন করত। তাঁর খুৎবায় প্রভাবিত হয়ে কতজন যে প্রকাশ্যে তওবা করত তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর ওয়ায ও তাওহীদী বক্তৃতা হিন্দুস্তানে তাক্বলীদ এবং শিরক ও বিদ'আতের তখতে তাউস উল্টিয়ে দিয়েছে। হাযার হাযার ব্যক্তি শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করে প্রকৃত তাওহীদবাদী ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেছে। তাঁর নূরানী চেহারা ও আকার-আকৃতি এমন ঈমানদীপ্ত ও পসন্দনীয় ছিল যে, তার উপর যার দৃষ্টি পড়ত সেই আমূল পরিবর্তিত ও তাঁর ভক্ত হয়ে যেত। উপরন্তু হাদীছের প্রতি তাঁর আমল এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জাযবা স্বর্ণের উপর কারুকার্যের মতো কাজে দিত'।[১৭]

প্রফেসর হাকীম এনায়াতুল্লাহ নাসীম সোহদারাভী বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর সাথে আমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হত। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন আলেম ছিলেন। সূক্ষ্মভাবে মাসআলা তাহক্বীক্বে তাঁর অপরিসীম যোগ্যতা ছিল। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সারগর্ভ ও প্রভাব বিস্তারকারী হত। শ্রোতারা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তাঁর বক্তব্য শুনত এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতে বদ্ধপরিকর হত'।[১৮]

মাওলানা জুনাগড়ী বক্তব্য দেয়ার সময় বিদ'আতীদেরকে মোটেই তোয়াক্কা করতেন না। তাওহীদী রোশনীতে আলোকিত হৃদয়ের গভীর থেকে নিঃসৃত তাঁর অগ্নিঝরা বক্তৃতা বিরোধীদের দেহমনে আগুন ধরিয়ে দিত। একবার টিটাগড়-এর নিকটবর্তী 'আঙ্গারা' নামক গ্রামে একটি জালসায় তিনি অগ্নিঝরা বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে মুক্বাল্লিদদের একটি গ্রুপ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা আদালতে ধর্ম অবমাননার মামলা দায়ের করে। এ মামলা দায়েরের অন্যতম একটা কারণ ছিল তাঁর রচিত 'দুর্রায়ে মুহাম্মাদী' (মুহাম্মাদী চাবুক) নামক লাজওয়াব গ্রন্থটি। বিরোধীরা শুধু মামলা দায়ের করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং দিল্লীতে অবস্থিত 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকা অফিস থেকে এর সকল কপি উধাও করে দেয়ারও প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। সৌভাগ্যক্রমে কিছু কপি তাদের হিংস্র থাবা থেকে বেঁচে যায়। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সংস্করণগুলি বের হয়। তাদের চাপে ইংরেজ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করলেও পরবর্তীতে হাযার হাযার কপি মুদ্রিত হয়ে জনগণের হাতে হাতে চলে যায়।

এ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বিরোধী পক্ষের উকিল ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)। মামলায় হাযিরা দেয়ার জন্য মাওলানা জুনাগড়ীকে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই কলকাতায় রওয়ানা দিতে হত। তখনকার দিনের যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত। ফলে বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি আদালতে উপস্থিত হতেন। তাঁকে সাহস যোগানোর জন্য বন্ধু মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) অনেক সময় অমৃতসর থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আসতেন। মামলার শেষ দিকে জুনাগড়ী কলকাতার একটি হোটেলে অবস্থান করতেন। একদিন হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় মাযহাবীরা তাঁর উপর বোতল বোম নিক্ষেপ করে। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান। অবশেষে মামলার রায় তাঁর পক্ষেই যায়।[১৯]

১৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৩৫, ৩৬।*
১৬. *ঐ, পৃঃ ৩৫-৩৬।*
১৭. *মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী, 'খতীবুল হিন্দ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুহাদ্দিছ জুনাগড়ী (রহঃ)-কে হালাতে যিন্দেগী', মুহাম্মাদ জুনাগড়ী রচিত খুৎবাতে মুহাম্মাদী-এর ভূমিকা (মুম্বাই : আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, নভেম্বর ২০০), পৃঃ ৯।*
১৮. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৫৮-৫৯।*
১৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৩৭-৩৯।*

১৯২৯ সালে এ মামলাটি দায়ের করা হয় এবং ১৯৩০ সালে শেষ হয়।[২০] মামলায় নিষ্কৃতি পেয়ে প্রথমে তিনি জজ আদালতের অতঃপর বিচারকের গাড়িতে চড়ে স্টেশনে পৌঁছেন। অতঃপর দারভাঙ্গার লাহেরিয়া সোরাই নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সেখানে তিনি ডা. ফরীদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। ডাক্তার ছাহেব তাঁর সম্মানে এক জাঁকজমকপূর্ণ জালসার আয়োজন করেন। এতে মাওলানা অমৃতসরীও উপস্থিত ছিলেন। মামলার রায় শোনার জন্য তিনিও কলকাতা গিয়েছিলেন।

মাওলানা জুনাগড়ীর বক্তব্যের প্রিয় বিষয় ছিল তাক্বলীদে শাখছী। এ সম্পর্কে বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি যখন কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন শ্রোতারা ঘুণাক্ষরেও টের পেত না যে, এর সাথে তাক্বলীদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু যখন আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করতেন এবং তাক্বলীদে শাখছীর সাথে তার সম্পর্ক বর্ণনা করতেন, তখন তারা তাজ্জব বনে যেত। দারভাঙ্গার উক্ত জালসায় ডা. ফরীদ তাঁর জন্য বক্তব্যের একটি বিষয় নির্ধারণ করে দেন। যার সাথে তাক্বলীদে শাখছীর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু তিনি সেই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাক্বলীদ-এর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। এতে সবাই তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করে।[২১]

বাহাছ-মুনাযারা : মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী একজন প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ মুনাযির (তার্কিক) ছিলেন। তিনি বহু মুনাযারায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ের মাল্যে ভূষিত হয়েছেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর তিনি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র হাফেয মাওলানা এনায়াতুল্লাহ ওয়াযীরাবাদীর সাথে দিল্লীর সদর বাজারে অবস্থিত কাল্লাঁ (বড়) মসজিদের সামনে অনুষ্ঠিত এক বাহাছে বিজয়ী হন।[২২]

১৯১৬ সালে রাজস্থানের খাণ্ডেলায় মাওলানা আব্দুল জব্বার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দিল্লী থেকে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আটাবী, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী এবং মাওলানা শরফুদ্দীন অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা অত্যন্ত চমৎকার ও ফলপ্রসূ হয়। তাদের দলীলসমৃদ্ধ বক্তব্য শ্রবণ করে কয়েকজন হানাফী আহলেহাদীছ হয়ে যান।

এর কিছুদিন পর হানাফী আলেম আব্দুল আযীয সেখানে গিয়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তিনি আহলেহাদীছদের সাথে মুনাযারা করারও ঘোষণা দেন। ১৪ই শাওয়াল মুনাযারার দিন নির্ধারিত হয়। নির্দিষ্ট দিনে হানাফী পক্ষ থেকে মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভী ও অন্য পাঁচজন আলেম এবং আহলেহাদীছ পক্ষ থেকে মাওলানা আব্দুল হাকীম নাছিরাবাদী *(শিক্ষক, মাদরাসা হক্কানী)*, মাওলানা আহমাদুল্লাহ *(শিক্ষক, মাদরাসা হাজী আলী জান, দিল্লী)*, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী ও মাওলানা আব্দুল গণী বেলা আড়াইটায় মুনায়ারার ময়দানে উপস্থিত হন। হানাফীদের পক্ষ থেকে মাওলানা আব্দুল আযীয বক্তব্য পেশ করেন। জুনাগড়ী তার বক্তব্যের জওয়াব দেন। বিকেল সোয়া চারটা পর্যন্ত বিতর্ক চলে। আছরের ছালাতের পর মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভী ও মাওলানা আব্দুল হাকীম-এর মাঝে রাফ'উল ইয়াদায়েন ও সশব্দে আমীন বলার বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। দেহলভী বলেন, যদি কুতুবে সিত্তাহ থেকে এমন কোন ছহীহ হাদীছ পেশ করা হয় যার মাধ্যমে সর্বদা রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সাব্যস্ত হয়, তাহলে আমি মেনে নিব। মাওলানা আব্দুল হাকীম ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি পেশ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন'।[২৩]

এছাড়া তিনি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর আরেকটি রেওয়ায়াত, মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ *(মুসলিম হা/৮৬৫)*, আবু হুমাইদ আস-সায়েদী *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)* প্রমুখ বর্ণিত হাদীছ সমূহ পেশ করে বলেন, দেখুন! এই হাদীছগুলিতে كان ও إذا শব্দ রয়েছে, যা স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার ফায়েদা দেয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ বর্ণনা দ্বারা সারাজীবনে একবারও রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করা সাব্যস্ত নেই। মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভী বলেন, যথার্থই তাই। আমিও এটাকে সুন্নাত মনে করি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সাব্যস্ত মানি। এভাবে আহলেহাদীছদের বিজয়ের মাধ্যমে মুনাযারার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল লতীফ খাণ্ডেলার বর্ণনামতে ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের মসজিদে ১৮ জন হানাফী আহলেহাদীছ হয়ে যান।[২৪]

রবীউল আউয়াল ১৩৪২ হিজরী মোতাবেক ১৯২২ সালে পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর যেলার 'আওয়ান' নামক গ্রামে এক ঐতিহাসিক বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রামে মৌলভী নিযামুদ্দীন ওরফে মোল্লা মুলতানী নামে এক হানাফী আলেম ছিলেন। তিনি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে সর্বদা বিষোদগার করতেন এবং তাদেরকে গালি-গালাজ করতেন। মুহাম্মাদ হাসান খান ছাহেব নামক এক ব্যবসায়ী অতিষ্ঠ হয়ে তাকে মুনাযারায় বসার আমন্ত্রণ জানান। এ লক্ষ্যে খান ছাহেব মাদরাসা ইসলামিয়া, খানপুরের সেক্রেটারী আব্দুল গণীকে দিল্লী পাঠান। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীকে মুনাযারায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। ব্যস্ততা সত্ত্বেও জুনাগড়ী

২০. *তারাজিম, পৃঃ ১৭৬।*
২১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৩৯-৪০।*
২২. *তারাজিম, পৃঃ ১৭৬; মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ২৮।*
২৩. *বুখারী হা/৭৩৫; মিশকাত হা/৭৯৩-৯৪ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০।*
২৪. *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩৭৪-৭৬। গৃহীত : আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ১৯১৬ মোতাবেক ২৯শে যিলহজ্জ ১৩২৪ হিঃ, রিপোর্ট : আব্দুল লতীফ খাণ্ডেলা।*

তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ১৩৪২ হিজরীর ৪ঠা রবীউল আউয়াল শুক্রবার সন্ধ্যায় উক্ত গ্রামে পৌঁছেন। মুনাযারা দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আগত জনসমুদ্র অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ওখানে আগে থেকেই মোল্লা মুলতানী সদলবলে উপস্থিত ছিলেন। বাহাছের বিষয় নির্ধারণ করা হয় 'গায়রুল্লাহ্র নামে নযর-নিয়ায পেশ করা ও মানত মানা জায়েয, না নাজায়েয'। তাছাড়া শুধু বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানীর নামে বানোয়াট অযীফা পড়াও বাহাছের বিষয় ছিল। জুনাগড়ীর সাথে বাহাছ না করার জন্য মোল্লা মুলতানী বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন এবং বলেন যে, আমার শর্তগুলি মানার পরেই মুনাযারা হবে। জুনাগড়ী তার সকল শর্ত মেনে নেন। তখন মুলতানী রাগতস্বরে বলেন, 'গায়ের মুক্বাল্লিদরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ। কেননা এরা তাক্বলীদ করে না। এজন্য প্রথমে আহলেসুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণ করুন! তারপর মাসআলাগুলির উপর আলোচনা হবে'। এক্ষণে জুনাগড়ী আহলেহাদীছদেরকে আহলে সুন্নাত প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মাগরিবের ছালাতের পর থেকে প্রায় রাত ১২-টা পর্যন্ত মুনাযারা চলে। মাওলানা জুনাগড়ী তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্যে বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা ৮০ হিজরীতে, ইমাম মালেক ৯৩, ইমাম শাফেঈ ১৫০ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশ থাকে যে, ৮০ হিজরীর পূর্বেতো এই চারজন সম্মানিত ইমামের মধ্যে কোন একজনের অস্তিত্বও এ পৃথিবীতে ছিল না। আল্লাহ্র দ্বীন ইসলাম এর পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ছিল। তাঁদের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগের কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদেরকে কি আপনারা আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ মনে করেন, না আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন? স্বয়ং চার ইমামকেও আহলে সুন্নাত মনে করেন, না তাদেরকেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ মনে করেন? যদি বলেন, সে সকল ছাহাবী, তাবেঈ, ইমাম চতুষ্টয় প্রমুখ আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ ছিলেন তবে ভিন্নকথা। আর যদি ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত থাকেন তাহলে প্রমাণিত হল যে, আহলে সুন্নাতের সংজ্ঞায় তাক্বলীদে শাখছী বিবেচ্য নয়। সুতরাং আজও সেই ব্যক্তিই আহলে সুন্নাত হতে পারে যে তাক্বলীদ থেকে মুক্ত। বিশ্ব প্রতিপালক তাঁর নবীর হাতে স্বীয় দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং বলেছেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا– 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে কি তাক্বলীদ ছিল? আপনি আজ যেটাকে ফরয ও ওয়াজিব এবং যার অমান্যকারীকে আহলে সুন্নাত ও মুসলমান থেকে খারিজ মনে করেন। একটু ভেবে-চিন্তে উত্তর দিবেন। কারণ আপনি তাক্বলীদকে তাও আবার চার ব্যক্তির তাক্বলীদে শাখছীকে ফরয ও ওয়াজিব মনে করেন। অথচ এই চারজন মহামতি ইমাম আল্লাহ্র দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাওয়ার এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর তাঁদের জন্মের পূর্বে তো কোনভাবেই তাঁদের তাক্বলীদ হতে পারে না। 'মুক্বাল্লাদ' বা অনুসৃত ব্যক্তিই যখন নেই, তখন 'মুক্বাল্লিদ' (অন্ধ অনুসারী) কিভাবে হবে? আর মুক্বাল্লিদ না থাকলে তাক্বলীদেরই বা অস্তিত্ব কোথায়? কমপক্ষে ৮০ হিজরী পর্যন্ত যখন উক্ত চারজনের কোন একজনেরও তাক্বলীদ ছিল না, তখন ৮০ হিজরীর পরে কে নবুঅত পেয়েছে? আর কোন্ আল্লাহ কোন্ নবীর হাতে কোন্ আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তাদের চারজনের মধ্য থেকে একজনের তাক্বলীদকে ফরয করেছেন? যেটা না মানার কারণে আজকে আমাদেরকে আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ মনে করা হচ্ছে'। প্রত্যক্ষদর্শী মাওলানা আব্দুল গণী বলেন, 'আমি ঐ দৃশ্য বর্ণনা করতে পারব না, যা সে সময় দৃশ্যমান হচ্ছিল। জালসায় নীরবতা বিরাজ করছিল। সবাই বাকরুদ্ধ ছিল। মাওলানার গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রাঞ্জল, পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল বক্তব্য মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিল। মোল্লা মুলতানী ঘাবড়িয়ে যান এবং তোতলামি করতে শুরু করেন'।[২৫]

এভাবে মাওলানা জুনাগড়ী যুক্তি ও দলীলের মাধ্যমে এমন জোরালো ও চমৎকার বক্তব্য দেন যে, মোল্লা মুলতানী তার যুক্তি ও দলীলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। জালসার সভাপতি একটি কাগজে সই করার জন্য উভয়কে আহ্বান জানান। যেখানে লেখা ছিল, যার কথা কুরআন ও হাদীছের অনুকূলে হবে তা মান্য করা হবে এবং যার কথা কুরআন ও হাদীছের বিপরীত হবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। জুনাগড়ী এতে স্বাক্ষর করলেও মুলতানী স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান।[২৬] এভাবে জুনাগড়ী উক্ত মুনাযারায় বিজয়ী হন এবং জনগণের সামনে প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে দেন।

দিল্লীর নিকটবর্তী মীরাঠ শহরে ১৯৪০ সালে 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ' বিষয়ে একটি মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। মাওলানা জুনাগড়ী বিশেষ মুনাযির হিসাবে সেখানে আমন্ত্রিত হন। আলোচনা সমাপ্ত করার পর দ্রুত অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করা জুনাগড়ীর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। তিনি মীরাঠের মুনাযারায়ও বক্তব্য প্রদান করে দ্রুত চলে এসেছিলেন। জালসা শেষ হওয়ার পর বিরোধীরা বলে, মাওলানা ছাহেব দলীলসহ সুন্দর বক্তব্য দিলেন। কিন্তু সূত্র তো উল্লেখ করলেন না। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা অমৃতসরী দ্রুত জিপ পাঠিয়ে যরূরী কিতাবাদি সহ তাঁকে হাযির হতে বললেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে গ্রন্থ খুলে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর সহ দলীল-আদিল্লাহ দেখালেন। এরপর থেকে তিনি বেশীরভাগ লিখিত মুনাযারা করতেন। তিনি রাজকোটে যে ঐতিহাসিক মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁর বিস্তারিত বিবরণ 'যাফরে মুহাম্মাদী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[২৭] তাছাড়া শী'আ ইমামিয়া ফিরকার সাথেও তিনি মুনাযারা করেছেন।[২৮]

(ক্রমশঃ)

---

২৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মুনাযারায়ে মুহাম্মাদী (দিল্লী : তাবি), পৃঃ ৩-৫।*
২৬. *ঐ, পৃঃ ২২-২৪।*
২৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৪০।*
২৮. *ঐ, পৃঃ ২৮।*

খলীফা হারূনুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি

*ইহসান ইলাহী যহীর**

(২য় কিস্তি)

আপনি সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকুন। কারণ তারা আপনাকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যখন দু'জন ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসে, তখন তাদের দু'জনের মধ্যে সেই আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয়পাত্র হয়, যে তাদের মধ্যে তার বন্ধুকে বেশী ভালবাসে'।[১]

আপনি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখুন, যদিও তারা আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের মন্দ আচরণের বদলা নিবেন না। কেননা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُونِي وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ أَفَأُكَافِئُهُمْ؟ قَالَ لاَ إِذاً تُتْرَكُونَ جَمِيعاً وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কিছু নিকটাত্মীয় আছে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের আচরণকে আমি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু তারা আমার প্রতি যুলুম করে। তাদের প্রতি আমি সদাচরণ করি, কিন্তু তারা দুর্ব্যবহার করে। আমি কি তাদের এহেন আচরণের বদলা নেব? তিনি বললেন, না। তাহলে তোমরা উভয়েই (রহমত হতে) বঞ্চিত হবে। বরং তুমি তাদের সাথে মহানুভবতা প্রদর্শন কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ। কেননা এভাবে যতদিন তুমি তাদের সাথে সদাচরণ করতে থাকবে, ততদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার উপর সাহায্যকারী ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন'।[২]

নিরুপায় মিসকীন ও মুখাপেক্ষী আগন্তুকের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজনে সাধ্যমতো সহযোগিতা প্রদান করুন। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, كُلُّ مَعروفٍ صَدَقَةٌ 'সকল সৎকর্মই হল ছাদাক্বা'।[৩]

আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ– 'রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিমেরই ছাদাক্বা করা উচিৎ। উপস্থিত লোকজন বলল, যদি সে ছাদাক্বা করার মত কিছু না পায়। তিনি বললেন, তাহ'লে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং ছাদাক্বা করবে। তারা বলল, যদি সে সক্ষম না হয় অথবা কাজ না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন বিপন্ন মাযলূমের সাহায্য করে। লোকেরা বলল, সে যদি তা না করে? তিনি বললেন, তাহ'লে সে সৎ কাজের আদেশ করবে, অথবা বলেছেন, নেকীর কাজের নির্দেশ করবে। তারা বলল, তাও যদি সে না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ এটাই তার জন্য ছাদাক্বা হবে'।[৪]

ভিক্ষুকের প্রতি দয়া করবেন। তাকে কোন কিছু দিয়ে বা ভাল কথা বলে আপনার দুয়ার হতে বিদায় করবেন। পরিচিত-অপরিচিত কারো প্রতি দয়া প্রদর্শনে উদাসীন হবেন না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَزْهَدْ فِى الْمَعْرُوفِ وَلَوْ مُنْبَسِطٌ وَجْهُكَ إِلَى أَخِيكَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ وَأَفْرِغْ مِنْ دَلْوِكَ فِى إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِى 'কোন সৎকর্ম সম্পাদনে বিমুখতা প্রদর্শন করবে না। যদিও তোমার বন্ধুর সাথে প্রফুল্ল চেহারায় আলাপ করা অথবা স্বীয় বালতি থেকে পানিপ্রার্থীর জন্য পানি ঢেলে দিয়েও হয়'।[৫]

কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করুন। কেননা আমার কাছে মহান আল্লাহ্র এ বাণী পৌঁছেছে যে, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ 'অতএব দুর্ভোগ (ঐসব) মুছল্লীর জন্য...' *(মা'ঊন ১০৭/৪)*। মুনাফিক সেই, যে প্রদর্শনের জন্য ছালাত আদায় করে, কিন্তু ছুটে গেলে তার ধারে-কাছেও যায় না। وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 'এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে' *(মা'ঊন ১০৭/৭)*। মা'ঊন হ'ল ঐ যাকাত, আল্লাহ যা ফরয করেছেন।

আপনি অবশ্যই রিয়া থেকে বিরত থাকবেন। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, রিয়াকারীর আমল আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। আর গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃত আমল তাঁর কাছে পরিশুদ্ধ হয় না। যাবতীয় আমল সর্বান্তকরণে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই নিবেদন করুন। কেননা নবী (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ– 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ

---

* *এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৪৫০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৬৬।*
২. *মুসলিম হা/২৫৫৮; আবুদাঊদ হা/৪৭৬৫।*
৩. *বুখারী হা/৬০২১, মুসলিম হা/১০০৫।*
৪. *বুখারী হা/৬০২২; মুসলিম হা/১০০৮; মিশকাত হা/১৮৯৫।*
৫. *আহমাদ হা/১৬৬৬৭, ছহীহাহ হা/১৩৫২।*

উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের নিকট থেকে কোন হাদীছ শুনে মুখস্থ করেছে এবং অপরের নিকট তা প্রচার করেছে'।[৬]

যে কোন মুসলিমের অন্তর তিনটি বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হয় না। (ক) আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইখলাছের সাথে আমল সম্পাদন করা (খ) ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্য গঠনমূলক সুপরামর্শ প্রদান করা (গ) মুসলমানদের সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকামিতা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে চতুষ্পার্শ থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।

আপনি অসৎ চরিত্র থেকে বিরত থাকবেন। কেননা তা আল্লাহ্র অবাধ্যতার দিকে আহ্বান জানায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম'।[৭]

নির্জনে-নিভৃতে আমল করার সময় আল্লাহ্র সামনে বিনয়ী হৌন। মানুষের উপর যুলুম করবেন না। যুলুম করলে আল্লাহ আপনার উপর তাদেরকে বিজয়ী করবেন। কেননা কতিপয় আলেম ছাহাবী কর্তৃক নবী (ছাঃ) থেকে আমার নিকট এ মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এই যুলুম তাদেরকে মানুষের রক্তপাত ঘটানো এবং হারামকে হালাল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল'।[৮]

সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা তা শাস্তিকে ত্বরান্বিত করে। আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إِنَّ أَعْجَلَ الخَيْرِ ثوابا صِلةُ الرَّحِمِ وإن أعْجَلَ الشَّرِّ عقوبةً البغيُ واليمينُ الغموسُ تَدَعُ الدِّيارَ بَلاقِع 'কল্যাণের প্রতিদান হিসাবে দ্রুত নেকী দেয়া হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে। দ্রুততম সময়ে যে পাপের শাস্তি দেয়া হয় তা হ'ল, সীমালংঘন। আর মিথ্যা কসমে অর্জিত উপার্জন গৃহসমূহকে জীবিকাশূন্য করে দেয়'।[৯]

আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে কসম করবেন না। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, لا تحلفوا بآبائكم لِيَحْلِفْ حالفٌ بالله أو لِيَسْكُتْ 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে কসম করবে না। কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে'।[১০] সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কসম করবেন না। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ 'তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করো না' *(বাক্বারাহ ২/২২৪)*।

মানুষের প্রতি দয়া করুন, মহান আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না'।[১১]

আল্লাহ্র আনুগত্যকে ভালবাসুন, আল্লাহ আপনাকে ভালবাসবেন এবং তার সৃষ্টিজীবের নিকটে আপনাকে প্রিয় করবেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সংগোপনে সিজদাবনত হৌন। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলেন, عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً 'তুমি সিজদাকে অপরিহার্য করে নাও। কেননা যখনই তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদার স্তর বাড়িয়ে দিবেন এবং এর মাধ্যমে তোমার একটি পাপ মোচন করবেন'।[১২]

ছালাত আদায়কে অপরিহার্য করে নিন। কেননা নবী (ছাঃ) বলেন, جُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة 'ছালাতকে আমার জন্য চক্ষু শীতলকারী করা হয়েছে'।[১৩]

আপনি আপনার অন্তরকে সংশোধন করুন। আল্লাহ আপনার বহির্জগতকে সংশোধন করে দিবেন। বাহন, বৈঠক ও কথা-বার্তায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করুন। কেননা মানুষেরা যখন নবী (ছাঃ)-এর পাশে ভীড় জমিয়েছিল তখন তিনি বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ 'হে লোকসকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা দ্রুততায় কোন নেকী নেই'।[১৪]

চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণের প্রাক্কালে তাকে যমীনের ঘাস-লতাপাতা খেতে দিন এবং গন্তব্যে পৌঁছার পরও তার অংশ দিন। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন,

৬. *তিরমিযী হা/২৬৫৬; দারেমী হা/২৩০; ছহীহাহ হা/৪০৩।*
৭. *ছহীহ বুখারী হা/২৩০৫; ছহীহ মুসলিম হা/১৬০১।*
৮. *বুখারী হা/২৪৪৭; মুসলিম হা/২৫৭৮, ২৫৭৯।*
৯. *বায়হাক্বী হা/২০৩৬৪; ছহীহাহ হা/৯৭৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৩৬।*
১০. *ছহীহ বুখারী হা/৬৪৭৬; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭।*
১১. *ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯।*
১২. *তিরমিযী হা/৩৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১৪৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৩৭।*
১৩. *নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহুল জামে হা/৩১২৪; মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ ছহীহ।*
১৪. *ছহীহ বুখারী হা/১৬৭১; ছহীহ মুসলিম হা/১২৮২।*

فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ-

‘তোমরা যখন এই নির্বাক চতুষ্পদ জন্তুগুলোর (বাহন) পিঠে আরোহণ করবে, তখন তাদেরকে তাদের চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। অনাবাদি-শুষ্কভূমি হলে শস্য-শ্যামল ভূমিতে তাদের নিয়ে যাবে। তোমরা রাতে ভ্রমণ করবে। কেননা রাতে পৃথিবীকে সংকুচিত করা হয়, যা দিনে হয় না। আর রাতে রাস্তায় ঘুমানো থেকে বিরত থাকবে। কেননা তখন তা হিংস্র প্রাণী এবং সাপ-বিচ্ছুদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়’।[১৫]

ধৈর্য ধারণ করুন এবং অপসন্দনীয় বিষয় হতে বিরত থাকুন। কষ্টদানকারী কারো প্রতি পাল্টা বদলা নিবেন না। যখন আপনাকে কেউ কষ্ট দান করবে যাকে আপনি অপসন্দ করেন, তার পাল্টা বদলা না নিলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إن الله يُحِبُّ الحَلِيْمَ الْغَنِيَّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীল, অমুখাপেক্ষী, লজ্জাশীল, চরিত্রবান ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ভালবাসেন’।[১৬]

সর্বোত্তম পন্থায় মন্দকে ভাল দিয়ে প্রতিহত করুন। কেননা এটা আল্লাহ্র নির্দেশ। অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা এর দ্বারা দুনিয়াতে বদনাম হয় এবং পরকালে তা লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى. قَالَ فَذَاكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا-

‘আল্লাহ যখন সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করে শেষ করলেন তখন আত্মীয়তার বন্ধন দাঁড়িয়ে বলল, এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় গ্রহণকারীর স্থান। আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব? আর তোমার সাথে যে ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আত্মীয়তার সম্পর্ক বলল, জী হ্যাঁ। আল্লাহ বললেন, এটা তোমার জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইচ্ছা করলে তোমরা এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পার, ‘যদি তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সম্ভবতঃ তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলিকে দৃষ্টিহীন করে দেন। তবে কি তারা কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৪)*।[১৭]

বৈষয়িক কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হলে ক্রোধ সংবরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র পারিতোষিকের কথা স্মরণ করুন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‘যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

নবী (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয়ই তিনি বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِى أَىِّ الْحُورِ شَاءَ ‘যে ব্যক্তি তার ক্রোধ বাস্তবায়িত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাগ দমন করে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে যে কোন হূর গ্রহণের স্বাধীনতা দিবেন’।[১৮]

আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবেন না। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কোন কথা বললে তা পূরণ করুন এবং তার উপর দৃঢ় থাকুন। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ‘তোমরা নিজেদের ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। (১) কথা বললে সত্য বল (২) ওয়াদা করলে তা পালন কর (৩) আমানত রাখা হ’লে সঠিকভাবে আদায় কর (৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত কর (৫) দৃষ্টি অবনমিত রাখ এবং (৬) হাত সংবরণ কর’।[১৯]

যখন এমন কোন কাজ করার ব্যাপারে আপনি বদ্ধপরিকর হন, যাতে আল্লাহ্র আনুগত্য নেই, তখন তা করবেন না; বরং কৃত কসমের কাফফারা আদায় করুন। কেননা আমার

১৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৫৯০; ছহীহুল জামে হা/১৭৭০; ছহীহাহ হা/৬৮২।*
১৬. *বায়হাক্বী শু‘আব; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩২০।*
১৭. *ছহীহ বুখারী হা/৪৫৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৬৬৮২।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/৪৭৭৭; তিরমিযী হা/২০২১; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৬; সনদ হাসান।*
১৯. *আহমাদ হা/২২৮০৯; মিশকাত হা/৪৮৭০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯০১,; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭০।*

Contents

কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, لا نَذْرَ فِي معصيةِ الله عز وجل وكَفّارَتُها كفّارَةُ يَمين 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন মানত নেই। আর তার কাফফারা হল শপথ ভঙ্গের কাফফারার মত'।[২০] তিনি আরো বলেন, النَّذْرُ يَمينٌ وكفّارتُه كفارةُ يَمِيْنٍ 'মানত হল শপথের মত। আর তার কাফফারা হল শপথ ভঙ্গের কাফফারার ন্যায়'।[২১]

যখন কোন কাজ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, কিন্তু অন্য কাজে অপেক্ষাকৃত বেশী কল্যাণ মনে করবেন, তখন সর্বাধিক কল্যাণকর কাজটি সম্পাদন করুন এবং কসমের কাফফারা প্রদান করুন। কেননা আমার কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে তিনি বলেন, إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ 'কোন শপথ করার পর তার চেয়ে কল্যাণকর অন্য কোন কাজ সম্পর্কে অবগত হলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দাও এবং সর্বোত্তম কাজটি সম্পাদন কর'।[২২]

বাচালতা থেকে নিবৃত্ত থাকবেন। এমন কোন কথা বলবেন না, যে ব্যাপারে আপনি জানেন যে, বিষয়টি এমন হতে পারে না। আর শাসকের জন্য এটি আরো জঘন্য।

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করুন। প্রত্যেক ছালাতে তাদের জন্য বিশেষভাবে দো'আ করুন। তাদের জন্য বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তার পূর্বে আপনার নিজের জন্য দো'আ করুন। কেননা ইবরাহীম ও নূহ (আঃ) দো'আ করেছিলেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*। এঁরা সকলেই পিতা-মাতার পূর্বে নিজের জন্য দো'আ করেছিলেন। আমার নিকট নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِى رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ- 'যে ব্যক্তি তার বয়স ও জীবিকা বৃদ্ধি হওয়া পসন্দ করে, সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করে এবং তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে'।[২৩]

আপনার প্রতি মানুষের কৃত অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। সাধ্যানুযায়ী তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। কেননা আমার নিকট রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'।[২৪]

পশুপৃষ্ঠে আরোহণ কালে বাহনে পা রাখার সময় বলুন بسم الله 'আল্লাহ্র নামে যাত্রা শুরু করছি'। অতঃপর ঠিকভাবে বসে ভ্রমণের সময় বলুন,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَ الْأَهْلِ-

'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার)। মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী' *(যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪)*। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে।[২৫] রাসূল (ছাঃ) বাহনে আরোহণ করে এভাবে দো'আ করতেন।

পানাহারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলুন। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই দো'আ পাঠ করুন। পানাহার শেষে বলুন, 'আল-হামদুলিল্লাহ'। অন্য লোকের সাথে খেতে বসলে আপনার সন্নিকট থেকে নিন। ডান হাত দিয়ে খান, বাম হাতে পানাহার করবেন না। খাবারের উপর থেকে বা অপরের সামনে থেকে খাবেন না। কেননা আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, জনৈক ব্যক্তি এরূপ করছিল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, اُذْكُرِ اللهَ وكُلْ مِمَّا يَليكَ وكلْ بِيَمينِك ولا تأكلْ بشمالك ولا تشربْ بشمالك 'আল্লাহ্র নাম নাও (বিসমিল্লাহ বলো), তোমার সন্নিকট হতে এবং ডান হাতে খাও, বাম হাতে পানাহার করো না'।[২৬]

সম্ভব হলে কেবলমাত্র বৃহস্পতিবারে সফর করুন। কেননা আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, নবী (ছাঃ) বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পসন্দ করতেন।[২৭]

(চলবে)

২০. *আবুদাঊদ হা/৩২৯০, মিশকাত হা/৩৪৩৫।*
২১. *আহমাদ হা/১৭৩৭৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৬০।*
২২. *বুখারী হা/৬৬২২, মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৪১২।*
২৩. *আহমাদ হা/১৩৮৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮।*
২৪. *তিরমিযী হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৩০২৫।*

২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।*
২৬. *আবুদাঊদ হা/৩৭৭৭; তিরমিযী হা/১৮৫৭;; ইবনে হিব্বান হা/১২৭৩।*
২৭. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৪৯৫০।*

Contents

কবিতা

মাযার

হাবিলদার মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
বিপিএ, সারদা, রাজশাহী।

মাযারকে মানুষ করেছে বাজার বলে ধর্মের প্রতিষ্ঠান,
কেউ ডাকে আল্লাহ আল্লাহ কেউ জপে হরি গান।
দিবা-নিশি ঘটছে কত লোকের যাওয়া আসা,
কারো চাওয়া জগৎ সংসার কারো স্রষ্টার ভালোবাসা।
কপালের ছাল তুলছে কেউ, কেউ ভিজায় পাকা দাড়ি,
চাওয়া-পাওয়া ছাড়াই কত জন ছাড়ছে ঘর-বাড়ী।
পর্দা নামের নেই চিহ্ন মুখে ধর্মের গান,
চাল-চলনে যায় না পাওয়া কোন ধর্মের প্রমাণ।
নানাভাবে ঘুরছে কত জন ছেড়ে বাড়ী-ঘর,
দিন-তারিখের হিসাব নিয়ে বসে কত সাধু সরদার।
জানে না তারা কুরআন-হাদীছ আর না জানে ফিক্বাহ,
বললে পারে না জবাব দিতে এসব কোন গ্রন্থে লেখা,
গ্রন্থের জ্ঞানে নয় জ্ঞান পায় মুখে মুখে জনে জনে
সাধুর বেশে সন্ন্যাসী হয়ে ছুটছে মাযার পানে।
মাযারে আসার লক্ষ্য কেবল গাইতে ধর্মের গীত,
বুঝা-বুঝির কারণে সেথা হিতে বিপরীত।
নানা কর্মে নষ্ট মাযার শিরকের বাজার হয় সেথা
মানব লিপ্সায় কলুষিত আজ পবিত্র আত্মা।

ধর্মের নামে

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ইসলামের নামে গণতন্ত্রের রাজনীতি
কখনও কোথাও চলবে না?
এই কথাটি সাহস করে
এদেশে কেউ বলবে না।
ধর্ম সবার সার্বজনীন
কারো ব্যক্তিগত নয়
লম্বা জামা তাসবীহ-পাগড়ী
ধর্মের মূল পরিচয় নয়।
ধর্মের নামে বোমাবাজি
কভু এটা জায়েয নয়
ধর্মের নামে গণতন্ত্রের রাজনীতি
ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।
ধর্মের নামে যারা দেশে
সৃষ্টি করে ত্রাস,
শত্রু তারা দেশ ও জাতির
করে দ্বীনের সর্বনাশ।

‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি

আব্দুল করীম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

আটাত্তরে তোমার পদযাত্রায় হক পেয়েছে দেশবাসি
তখন হ’তে তোমার সাথে বহু মানুষ আছে মিশি
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
তোমায় পেয়ে হক পেয়েছি আঁধার গেছে ঘুচি,
অহি-র আলোয় জীবন আলোকিত বলে আমি খুশি,
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
শিরক ও বিদ‘আত আগে বুঝিনি বুঝেছি এ পথে আসি
আমার কত বন্ধু ছিল তারা জাহেলী স্রোতে গেছে ভাসি
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
জন্মসূত্রে আহলেহাদীছ হয়েও বুঝতাম না কুরআন-হাদীছ
হক যেন ছিল অজানা মোর ছিল না তার হদিছ।
তোমার মাঝেই হক পেয়ে তাইতো বড় খুশি
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
বিশ্ব ভুবনে হকের সন্ধানে
ব্যাকুল কত আদম সন্তান,
এ কাজেই লিপ্ত থেকে কাটায় তারা দিবানিশি!
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
বহু মানুষ শুদ্ধ হয়েছে ফিরেছে তাদের হুঁশ
সঠিক আমল করতে শিখেছে তোমার পথে আসি
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
তোমার কণ্ঠরোধ করিতে তোমার হিম্মত দমিয়ে দিতে
কত অপশক্তি বেঁধেছিল জোট চক্রান্ত করেছে সকলে মিলে মিশি
তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে সব গেছে বানে ভাসি
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।
হকের খোঁজে কেউ কবর-মাযারে যায়
কেউ মন দেয় তরীকায়
কেউবা আবার পীরের পায়ে ভক্তিতে চুমু দেয়।
সবই ভুল বুঝে লাগে না কাজে
অহি-র আলোতে গিয়েছে ধূলায় মিশি,
‘যুবসংঘ’ তোমায় ভালবাসি।

***

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬
তৌফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. সরাসরি পর্দাবিহিন ও দোভাষী ব্যতীত কথা বলবেন *(বুখারী হা/৭৪৪৩)*।
২. 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি (সালাম) শান্তি' *(রা'দ ১৩/২৪)*।
৩. সুবহানাকা আল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র) *(ইউনুস ১০/১০)*।
৪. আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য) *(ইউনুস ১০/১০)*।
৫. তাদের লক্ষণ দেখে চিনবে *(আ'রাফ ৭/৪৯)*।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভৌগলিক প্রশ্ন)-এর সঠিক উত্তর

১. ইয়াংসিকিয়াং, চীনে। ২. বৈকাল হ্রদ, সাইবেরিয়া, রাশিয়া।
৩. কাস্পিয়ান, এশিয়া-ইউরোপ। ৪. টিটিকাকা, বলিভিয়ায়।
৫. মারেডালিয়া।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৭

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তবে তিনি অসুস্থ থাকায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশের সার্বিক ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর আন্দোলন। এ সংগঠন এদেশে চারটি ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অথচ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সোনামণি'। কেননা আজকের সোনামণিরাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানব শিশু ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নি উপাসক বানায়। তাই অভিভাবক হিসাবে আমাদের উচিত সোনামণিদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। পরিশেষে তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী, বিজয়ী সোনামণি এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, গ্যালাক্সি মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, তেরখাদিয়া, রাজশাহী-এর পরিচালক ডা. খন্দকার হালীমুযযামান ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (এমএস কোর্স), জেনারেল সার্জারীর চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আতীকুর রহমান, জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আব্দুল মুন'ইম প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৬টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সোনামণিদের মধ্য থেকে আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও সোনামণি'র পরিচিতি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করে আরবী ভাষায় মাযহারুল ইসলাম (নওগাঁ) ও ইংরেজী ভাষায় ইবরাহীম (গাইবান্ধা)। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দরসে কুরআন 'মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়' *(মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৭)* সম্পর্কে বাংলায় বক্তব্য দেয় আবু বকর (জয়পুরহাট)। প্রতিযোগিতার সিলেবাসভুক্ত 'আক্বীদা' অংশ পড়ে শুনায় মুনাওয়ারুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও ১০টি হাদীছ মুখস্থ পাঠ করে রিযওয়ান (দিনাজপুর)। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৪০ জন বালক ও ৭০ জন বালিকা সহ মোট ২১০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪৪ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৯ ও ৩০ তম পারা।

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ (বগুড়া), **২য় :** আব্দুর রহমান (বগুড়া), **৩য় :** ফাহীম ফায়ছাল (মেহেরপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মাহদিয়া (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **২য় :** শাজিয়া জাহান শেফা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **৩য় :** সীমানুর (বগুড়া)।

২. হিফযুল কুরআন (সূরা নিসা ৫৯, বনু ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ ও তাহরীম ৬ নং আয়াত) **মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ (১০টি) অর্থসহ।**

বালক গ্রুপ : ১ম : রিযওয়ান (দিনাজপুর), **২য় :** মুনারুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), **৩য় :** মুহাম্মাদ সোহাগ হাসান (ঢাকা) ও শরীফুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম), **২য় :** তাসলীমা (বগুড়া), **৩য় :** ফিরোজা (নাটোর) ও সুমাইয়া খাতুন (সাতক্ষীরা)।

৩. দো'আ

বালক গ্রুপ : ১ম : মাহমূদুল হাসান (গাইবান্ধা), **২য় :** ইমরান (বগুড়া), **৩য় :** রিযওয়ান (দিনাজপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাজেদা (কুমিল্লা), **২য় :** ফিরোযা (নাটোর), **৩য় :** ফাতেমা (রাজশাহী)।

৪. সাধারণ জ্ঞান

বালক গ্রুপ : ১ম : সামীউল ইসলাম (বগুড়া), **২য় :** রিযওয়ান (দিনাজপুর), **৩য় :** শাহাদত ইসলাম (দিনাজপুর) ও মু'তাছিম বিল্লাহ (নওগাঁ)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : হুমায়রা (রাজশাহী), **২য় :** রুকাইয়া খাতুন (রাজশাহী), **৩য় :** মুনীরা (সিরাজগঞ্জ) ও শারমীন আখতার (রাজশাহী)।

৫. সোনামণি জাগরণী

বালক গ্রুপ : ১ম : আলে-ইমরান (রাজশাহী), **২য় :** শাহরিয়ার ইসলাম (কুমিল্লা), **৩য় :** আরাফাত (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আয়েশা (বগুড়া), **২য় :** বিলকীস (বগুড়া), **৩য় :** নাছরীন (রাজশাহী) ও সাবীহা খাতুন (বগুড়া)।

৬. প্রতিযোগিতার বিষয় : হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা আরবী ও বাংলা

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল কাদের (বগুড়া), **২য় :** মুহাম্মাদ মাহদী (কুমিল্লা), **৩য় :** ফায়ছাল মাহমূদ (রাজশাহী)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম), **২য় :** হুমায়রা (রাজশাহী), **৩য় :** ফাতেমা (রাজশাহী)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) : বিষয়- সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

১ম : আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী), **২য় :** আব্দুল হাসীব (খুলনা), **৩য় :** আবু রায়হান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

Contents

স্বদেশ

দু'লাখ রোহিঙ্গাকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার

-মেজর জেনারেল (অব.) ফযলুর রহমান

বিজিবি'র সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) আ. ল. ম. ফযলুর রহমান মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলে অবিলম্বে জাতিসংঘ শান্তি মিশন পাঠানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, বাংলাদেশের ডিপ্লোমেটিক লাইনটা হওয়া উচিৎ যাতে জাতিসংঘ থেকে ফোর্স পাঠানো হয় রাখাইনে। এতে একটা লাইন ড্র হবে, যাতে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাবে। বাংলাদেশে যে সকল রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি মনে করি অতিদ্রুত বাংলাদেশের উচিৎ ইউএন মিশন করা, যাতে শান্তি মিশন ইনভলভ হয়। গত ৯ই সেপ্টেম্বর চ্যানেল আই এ তৃতীয় মাত্রা নামের এক টকশোতে তিনি এসব কথা বলেন। ২০০১ সালে আ ল ম ফযলুর রহমান কুড়িগ্রামের বরইবাড়ি সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় তাকে বীরের মর্যাদা দেয়ার দাবী উঠেছিল।

জেনারেল ফযলুর রহমান বলেন, ৫০-এর দশক থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন শুরু করেছে মিয়ানমার সরকার। এই দুঃখ-দুর্দশা ১৯৭৮ থেকে দেখে আসছি। এটা আর কত দিন চলবে? মিয়ানমার এমন ফাযলামী করবে আর আমরা এটা মেনে নেব তা হ'তে পারে না। যদি মিয়ানমার সংযত না হয় তাহ'লে আমরা কি করবো? আমরা সারাজীবন তাদেরকে খাওয়াতে থাকব? আর নানা ধরনের ক্রাইম শুরু হবে? এটা আমরা করতে পারি না। আমি মনে করি শরণার্থী রোহিঙ্গাদের এক জায়গায় রেখে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র দিয়ে অন্তত ২ লাখ ফোর্স তৈরী করা দরকার। অতঃপর ব্যাক বাই আর্মি মিয়ানমারে পাঠিয়ে রাখাইন প্রদেশটাকে বাংলাদেশের অংশ করে নিয়ে নিতে হবে।

পঞ্চগড়ে চা চাষ খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

সিলেটের চা-কে হার মানিয়ে দার্জিলিং মানের চা উৎপাদিত হচ্ছে এখন পঞ্চগড়ে। পঞ্চগড়ের মাটি ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় পঞ্চগড়ে সবুজ মাঠে পরিণত হয়েছে চা বাগান। পঞ্চগড় যেলায় ১৯৯৯ইং সালে চা চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সে মোতাবেক ২০০০ সালে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই)-এর অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে পঞ্চগড়ে সর্বপ্রথম কাজী এন্ড কাজী চা বাগান ৬২৭.০০ একর জমিতে অর্গানিক চা চাষ শুরু করে, যা পরবর্তীতে মীনা নামে পরিচিতি লাভ করে। এর পাশাপাশি তাদের পরামর্শে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ শুরু করেন নিজস্ব জমিতে চা নার্সারী তৈরি করেন যেলার বেশ কিছু মানুষ। ফলে ২০০২ সালে ১৮৪.২১ হেক্টর জমির চা আবাদিতে পরিণত হয়।

এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়তে বাড়তে ২০১৬ সালে ৯টি প্রতিষ্ঠিত চা বাগান সহ ক্ষুদ্র টি এস্টেট, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষী ও ক্ষুদ্র চা চাষীদের মাধ্যমে সর্বমোট ১৮৪৫.২৭ হেক্টর জমিতে ১,৪৫,৭২,৯৩৭ কেজি সবুজ কাঁচা চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৮ সাল নাগাদ পঞ্চগড়ে ১৩টি চা কারখানা চালুর প্রক্রিয়া চলছে।

পঞ্চগড়ে চা চাষের যে বিপ্লব ঘটেছে তা মূলত বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এ নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টার ফল। এতে করে এই উত্তরের জনপদটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। তেমনি এই অঞ্চলের হাযার হাযার মানুষের দারিদ্র বিমোচনে দারুণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দেশে মুখ গহ্বরের ক্যান্সারে আক্রান্তদের ৯০ শতাংশ ধূমপায়ী

ফুসফুস ক্যান্সারের পর বাংলাদেশে মুখ গহ্বরের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। আর মুখ গহ্বর ক্যান্সারে আক্রান্তদের ৯০ শতাংশই ধূমপায়ী। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সার সোসাইটি' আয়োজিত সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এসব তথ্য দেন।

'বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সার সোসাইটি'র সভাপতি ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফিসিয়াল সার্জারী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সিরাজুল ইসলাম।

সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা জানান, মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের জন্য দায়ী জর্দা। আর এ জর্দা পান দিয়ে এখনো এদেশে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। তারা জানান, ধূমপান, তামাক থেকে তৈরী জর্দা, গুল, খৈনিতে আসক্তরা সাধারণের চেয়ে ক্যান্সারে ছয় গুণ বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত হ'লেও এদেশে যেমন চিকিৎসক সঙ্কট রয়েছে তেমনি সঙ্কট রয়েছে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য রেডিও অথবা কেমোথেরাপি চিকিৎসার।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের বসবাস থাকলেও মাত্র ১৭টি রেডিওথেরাপি সেন্টার রয়েছে।

বিদেশ

ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বিশ্বের বাস্তুহারাদের সংখ্যা

সারাবিশ্বে বর্তমানে ছয় কোটি ৫৬ লাখ মানুষ বাস্তুহারা বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বসংস্থাটি জানায়, এই সংখ্যা আগের যে কোন রেকর্ডকে হার মানিয়েছে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের তথ্যমতে, এই সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক কমিশনার ফিলিপো গ্রান্ডি জানান, এটা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ব্যর্থতা। তিনি বলেন, 'বিশ্ব এখন শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়। আপনি সারাবিশ্বেই সহিংসতা দেখতে পাবেন। আর এ কারণেই লাখ লাখ মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।' তার ভাষায়, দেশে দেশে পুরনো সব বিরোধ অব্যাহতভাবে দীর্ঘতর হচ্ছে এবং নতুন বিরোধ দেখা দিচ্ছে। ফলে মানুষ ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে... বাধ্য হয়ে ঘরবাড়ি ছাড়ার বিষয়টি সেই যুদ্ধেরই প্রতীক, যা শেষ হয় না।

গ্রান্ডি বলেন, বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতেই এর সংখ্যা বেশী। ঘরহারা মানুষগুলোর ৮৪ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলো থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলোকে কিভাবে বলব, তোমরা শরণার্থীদের আশ্রয় দাও, যেখানে ধনী দেশগুলোই তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, সাড়ে ছয় কোটি ঘরছাড়া মানুষের মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা দুই কোটি ২৫ লাখ। চার কোটি তিন লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ও ২৮ লাখ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রত্যাশী। আর শরণার্থীদের মধ্যে ৫৫ লাখই সিরিয়ার নাগরিক। আফগানিস্তানের ২৫ লাখ এবং দক্ষিণ সুদানের ১৪ লাখ শরণার্থী রয়েছে।

Contents

মুসলমান হওয়ার কারণেই শান্তিপ্রিয় রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন

-পোপ ফ্রান্সিস

রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। তিনি বলেছেন, 'তারা (রোহিঙ্গা) ভালো মানুষ। তারা শান্তিপ্রিয়। খ্রিষ্টান না হ'লেও তারা আমাদের ভাই। যুগ যুগ ধরে তারা নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে।' ভ্যাটিকান রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন পোপ। পোপ বলেন, শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে আজ রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে তাদের।

রোহিঙ্গারা বাঙালী, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে

-মিয়ানমার সেনাপ্রধান

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং লাইং। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক মন্তব্যে তিনি তার দেশের অন্য সব মানুষের প্রতি এই আহ্বান জানান। মিয়ানমার সেনাপ্রধানের মতে রোহিঙ্গারা সে দেশের মানুষ না। তারা মূলত বাঙালী। তিনি বলেন, 'তারা রোহিঙ্গা হিসাবে নিজেদের স্বীকৃতি চায়। কিন্তু তারা কখনোই আসলে মিয়ানমারের নিজস্ব কোন নৃগোষ্ঠী ছিল না। তারা মূলত বাঙালী। আর এই বাঙালী ইস্যুটি একটি জাতীয় ইস্যু। আমাদেরকে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

[এই স্বার্থান্ধ অন্ধ ব্যক্তিটিকে স্রেফ করুণা করতে হয় (স.স.)]

কলম্বিয়ায় ৫০ বছরের যুদ্ধের অবসান ঘোষণা

কট্টর বামপন্থী ফার্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের সঙ্গে কলম্বিয়ায় ৫০ বছরের যুদ্ধ অবসানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হুয়ান মানুয়েল সান্তোস। প্রায় চার বছর কলম্বিয়ার ভেতরে-বাইরে শান্তি আলোচনার পর গত ১৫ই আগষ্ট তিনি নিজে শেষ অস্ত্রের কন্টেইনার বন্ধ করেন। পরে তা জাতিসংঘের পরিদর্শকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'সংঘর্ষ সত্যিই শেষ হয়েছে। আমাদের জাতি একটি নতুন পর্যায় শুরু করতে যাচ্ছে। আমাদের জন্য এটা সত্যিই একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত'। তিনি আরও বলেন, '১৯৮ বছরের একটি প্রজাতন্ত্র আমাদের। এর আগে এমন যুদ্ধের ইতিহাস নেই কলম্বিয়ার। আজ সত্যিই এই যুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল'।

অনুষ্ঠানে ফার্ক বিদ্রোহীরা জানান, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন তাঁরা।

১৯৬৪ সাল থেকে দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন বামপন্থী ফার্ক গেরিলারা। লাতিন আমেরিকায় ফার্ক-কলম্বিয়া সরকারের লড়াইই সবচেয়ে পুরোনো গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারায় ২ লাখ ৬০ হাযারের বেশী লোক। পাঁচ দশকের এ যুদ্ধে নিখোঁজ হয়েছে আরও ৬০ হাযার মানুষ। ঘরবাড়ি হারিয়েছে কয়েক লাখ। এছাড়া সরকারি হিসাব মতে, দীর্ঘমেয়াদি এই যুদ্ধে প্রায় আড়াই লাখ ফার্ক বিদ্রোহী নিহত হয়েছে। এছাড়া অন্তত পাঁচ লাখ বিদ্রোহী পালিয়ে গেছে।

এক সময়ে কলম্বিয়ায় ধনী-দরিদ্রের তীব্র বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে প্রথমে কয়েকজন কৃষক এবং ভূমি শ্রমিক মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিল ফার্ক নামে এই গেরিলা সংগঠনটি। মূলতঃ কলম্বিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধেই লড়াই করতো তারা। এছাড়া তারা তেলের সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ লাইন, বিভিন্ন সেতু এবং সামাজিক ক্লাবে বোমা হামলা চালাতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের আক্রমণের শিকার হ'ত বেসামরিক নাগরিকরা। অনেককে অপহরণ করে নিয়ে যেত তারা। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হ'ত।

মহাশূন্যে যুদ্ধের জন্য 'মহাকাশ বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের

'মহাকাশ বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এই বাহিনী গঠনের জন্য একমত হয়েছে মার্কিন হাউজ আর্মড সার্ভিস কমিটির সদস্যরা। মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ষষ্ঠ এই শাখা মহাশূন্যে সামরিক তৎপরতায় নিয়োজিত থাকবে। প্রয়োজনে যুদ্ধও করবে এই বাহিনী। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর কোনও নতুন শাখা খোলা হচ্ছে।

আগামী দু'বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কিন বিমান বাহিনীর বৈপ্লবিক সংস্কারের অংশ হিসাবে এই বাহিনী তৈরী হচ্ছে।

মার্কিন বিমান বাহিনী বর্তমানে মহাকাশ বিমান এক্স-৩৭বি দিয়ে একটি গোপন মিশন পরিচালনা করছে। মহাকাশে টানা ৭১৮ দিন থাকার রেকর্ড সৃষ্টি করে সম্প্রতি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে এক্স-৩৭বি। তবে এসময় এটি কি দায়িত্ব পালন করেছে তা গোপন রয়েছে।

[এই বানর-শূকরের বংশধররা পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এবার মহাশূন্যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার পাঁয়তারা করছে। এদের পিছে পিছে অন্যেরাও যাবে। মানুষের কল্যাণে আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ এরা মানুষ হত্যার খাতে ব্যয় করছে। আল্লাহ এদের হেদায়াত দাও অথবা মৃত্যু দাও (স.স.)]

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীনের রাজনীতিতে নতুন মোড়!

গঠিত হচ্ছে হামাস-ফাতাহ'র ঐক্য সরকার

দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক বিরোধের অবসান গঠিয়ে অবশেষে ফিলিস্তীনে হামাস ও ফাতাহ গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের সরকার গঠনের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়েছে। গাযা ও পশ্চিম তীরের দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হামাস ও ফাতাহর মধ্যে সমঝোতা হয়েছে।

ফাতাহ'র সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাযী হয়েছে গাযা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাস। আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যের সরকার গঠন ও একটি অভিন্ন সাধারণ নির্বাচন আয়োজনে ফাতাহর সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছেছে তারা। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, ফাতাহ নেতা ও ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের প্রস্তাবিত শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে এবং শর্তানুযায়ী গাযায় হামাসের প্রশাসনিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষের মত সমান্তরাল সরকার হিসাবে গাযা উপত্যকা শাসন করে আসছিল হামাস। এর ফলে ফিলিস্তীনের রাজনৈতিক সংকট দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠনে নানামুখী সমস্যা তৈরী হয়।

২০০৭ সাল থেকে হামাস ও ফাতাহ পৃথক দু'টি সরকার পরিচালনা করে আসছে। ইসরাঈলের অধিকৃত পশ্চিম তীরে স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষের সরকার পরিচালনা করে আসছিল মাহমূদ আব্বাসের ফাতাহ এবং গাযার নিয়ন্ত্রণ ছিল হামাসের হাতে। দু'পক্ষের মধ্যে বারবার সমঝোতার চেষ্টা দেখা গেলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি হামাস মাহমূদ আব্বাসকে গাযায় ঐক্য সরকার পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, ফাতাহর সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত তারা।

হামাসের আহ্বানের পর ফিলিস্তীনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট নিরসনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

গাযা উপত্যকায় প্রায় ২ লাখ মানুষের বসবাস। সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে ক্রমেই মানবিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। নানা সমস্যার মধ্যে বিদ্যুৎ ও পানির ভয়াবহ সংকট তৈরী হয়েছে। গাযার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক এবং এখানে বেকারত্বের হার বিশ্বের সবচেয়ে বেশী।

সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম শায়খ সালমান আল-'আওদাহ ও ড. 'আয়েয আল-ক্বারনী সহ ২০ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি গ্রেফতার

সঊদী আরবে সম্প্রতি প্রায় ২০ জন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, লেখক, আইনজীবী ও সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যাক্তিদের মধ্যে আছেন দেশটির প্রখ্যাত আলেম শায়খ সালমান আল-'আওদাহ, ড. 'আয়েয আল-ক্বারনী ও ড. আলী উমারী। এছাড়া বিশিষ্ট সমাজকর্মী ঈসাম জামীল, শিক্ষাবিদ আব্দুল আযীয আব্দুল লতীফ, 'আওদার সহোদর খালেদ 'আওদাহ, মূসা শরীফ প্রমুখ।

১৯৯১ সালে কুয়েতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সঊদী আরবে মার্কিন সেনা উপস্থিতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন শায়েখ সালমান ও ড. ক্বারনী। এছাড়া এই দু'জনের সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

গ্রেফতারের আগে শায়খ আওদাহ সম্প্রতি প্রিন্স মোহাম্মদের সঙ্গে কাতারের আমীর শেখ তামীম-এর ফোনালাপকে স্বাগত জানান এবং তাদের অন্তর মিলিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, নির্দিষ্ট করে না বলা গেলেও, গ্রেফতারকৃতের সংখ্যা ২০ ছাড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রয়েছেন লেখক, সাংবাদিক এবং অধিকারকর্মী। সংস্থাটির মুখপাত্র বলেন, 'সঊদী আরবে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী সংখ্যক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার এবারই প্রথম।

পাকিস্তানী দুই ভাইয়ের ৫৮ সন্তান!

'আল্লাহই ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন'। চারপাশের সন্তানদের দেখিয়ে এ মন্তব্য করলেন ৩৬ সন্তানের জনক ৫৭ বছর বয়সী গুলযার খান। তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ছিল নানা বয়সী ২৩ সন্তান। বাকি ১৩ সন্তান আশপাশে কোথাও ছিল। আরও এক সন্তান আসন্ন। তবে এত সন্তান নিয়ে মোটেও বিচলিত নন পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার দক্ষিণাঞ্চলের যেলা বানুর এই বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'আল্লাহ এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই কেন আমি শিশু জন্মের প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাধা দেব? ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, তাঁর এত সন্তান হওয়ায় সবাই মিলেই একটি পুরো ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে পারে। তাদের খেলার জন্য কোন বন্ধুরও প্রয়োজন হয় না।

গুলযার খানের ১৫ ভাই-বোনের একজন মাস্তান খান ওয়াযীর (৭০)। ভাইয়ের মতো তাঁরও তিন স্ত্রী। তবে ভাইয়ের তুলনায় তার সন্তান কম মাত্র ২২ জন। তবে নাতী-নাতনীর সংখ্যা এত বেশী যে, সংখ্যায় ঠিক কত তা তিনি বলতে পারেন না। তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাদের খাবার ও সম্পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু লোকজনের বিশ্বাস কম'।

[মানব বংশ ধ্বংসকারী যুক্তিবাদীদের মুখে রীতিমত চপেটাঘাত বৈকি। আল্লাহ্র উপর ভরসাকারীদের জন্য সুসংবাদ (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মানবভ্রূণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ ডিএনএ অপসারণ

বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানবভ্রূণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ ডিএনএ অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। অপসারণ করা ডিএনএটি বংশানুক্রমিক রোগ বহনের জন্য দায়ী বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করছেন, এই সফলতার সূত্র ধরেই বংশানুক্রমিক এমন আরও ১০ হাযার ত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি ও সল্ক ইনস্টিটিউট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইনস্টিটিউট ফর বেসিক সায়েন্সের একদল বিজ্ঞানী এই সাফল্য পেয়েছেন।

গবেষকেরা মূলত হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতি পাঁচশ' জনের মধ্যে একজন এই সমস্যায় আক্রান্ত হন। ত্রুটিযুক্ত একটি মাত্র জিনের কারণে এই সমস্যায় আক্রান্ত হয় মানুষ। এই পদ্ধতিতে শতভাগ সাফল্য না পেলেও ৭২ শতাংশ ক্ষেত্রে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ত্রুটিমুক্ত ভ্রূণ সৃষ্টি হ'তে দেখা গেছে।

গবেষক দলের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ড. শৌখ্রাত মিতালিপভ বলেন, এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রোগের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ২০১৫ সাল থেকে মানবভ্রূণ সম্পাদনা করার চেষ্টা করছিলেন বিজ্ঞানীরা।

লিভারপুলে তৈরী হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

যুক্তরাজ্যের একটি বায়ু বিদ্যুৎ কোম্পানি সাগর উপকূলে সবচেয়ে শক্তিশালী বায়ু টার্বাইন দিয়ে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে। এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে ২ লাখ ৩০ হাযার পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। ৮ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে ১৯৫ মিটার লম্বা টার্বাইন। এর ব্লেডগুলো হবে ৮০ মিটার লম্বা। এগুলো একবার ঘোরলেই একটি বাড়ির জন্য ২৯ ঘণ্টার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এ ধরনের ৩২টি টার্বাইন ব্যবহার করবে কোম্পানিটি। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী হেনরিক পলসেন বলেন, এ প্রকল্পই বলে দিচ্ছে যে, উপকূলে বায়ু বিদ্যুৎ শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। উদ্ভাবনীর মাধ্যমে এ শিল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমাতে এবং বিশ্বব্যাপী এ শিল্পের বিকাশে সহায়ক হবে। লিভারপুল সিটি অঞ্চলের মেয়র স্টিভ রথারম বলেন, উপকূলে বায়ু বিদ্যুতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস আরও সহজলভ্য হবে।

[বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণী এদিকে নযর দিলে জাতি উপকৃত হবে (স.স.)]

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বন্যার্তদের পাশে আমীরে জামা'আত

[২২, ২৭ ও ২৯শে আগষ্ট'১৭ মঙ্গল, রবি ও মঙ্গলবার]

ভারী বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলে মধ্য আগষ্ট থেকে সপ্তাহকালের ব্যবধানে পরপর দু'দফা শতাব্দীকালের ভয়াবহতম বন্যায় উত্তরাঞ্চলের ২০টি যেলা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ যেলা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বানভাসি মানুষের সহায়তায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ত্রাণ কর্মসূচী হাতে নেয়। প্রথম দফা বন্যায় দিনাজপুর, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমণিরহাট ও কুড়িগ্রামের পানিবন্দী পরিবার সমূহের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় দফা বন্যা আরও ভয়াবহ ও ব্যাপক রূপ ধারণ করায় নগদ অর্থের পাশাপাশি শুকনা খাবার ও স্যালাইন সহ অন্যান্য বস্তু প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজশাহী থেকে চাউল, ডাল, তেল, পেয়াজ, মরিচ, চিড়া, মুড়ি সহ মোট ১২টি আইটেম সমৃদ্ধ ত্রাণের প্যাকেট প্রস্তুত করে ট্রাক যোগে পাঠানো হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট যেলা নেতৃবৃন্দ এইসব ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দফা বন্যার সময় ত্রাণের সাথে সাথে দুর্গত এলাকায় কুরবানীর গোশত বিতরণ করা হয়। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২২শে আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৭-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ মাইক্রো যোগে রাজশাহী হ'তে গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সকাল সাড়ে ৯-টায় বগুড়ার মাটিডালীতে পৌঁছলে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করেন এবং সফরসঙ্গীদের নিয়ে হোটেলে সকালের নাশতা গ্রহণ করেন। এখান থেকে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সহ সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম পৃথক প্রাইভেটকার যোগে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হন। অতঃপর বেলা সাড়ে ১১-টায় তিনি যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন কাটাখালী করতোয়া ব্রীজের নিকটে পৌঁছেন। আমীরে জামা'আতের পৌঁছার পূর্বেই ট্রাক আনলোড করে ত্রাণ সামগ্রী নৌকায় উঠানো হয়। অতঃপর আমীরে জামা'আত নৌকা যোগে বানভাসি মানুষদের কাছে গিয়ে নৌকায় দাঁড়ানো অবস্থায় পানিবন্দীদের হাতে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেন।

বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ১ম দফায় তিনি রঘুনাথপুর, ফুলবাড়ীর কিছু অংশ, পাড়-রঘুনাথপুর, ফতেউল্লাপুরের কিছু অংশ ও চন্ডিপুর গ্রামে ত্রাণ বিতরণ করেন। এখানে পৌঁছে তিনি সাথীদের নিয়ে চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন। অতঃপর এখানে অপেক্ষমাণ পূর্ব তালিকাভুক্ত বন্যার্ত পরিবার সমূহের মধ্যে ত্রাণের প্যাকেট বিতরণ করেন। এ সময় তিনি বানভাসি মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন। তিনি তাদেরকে বিপদে ধৈর্যধারণ এবং যাবতীয় অন্যায় ও হারাম কাজ থেকে বিরত থেকে ছবর-ছালাত ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানান।

প্রথম দফা ত্রাণ বিতরণ শেষে আমীরে জামা'আত সাথীদের নিয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের আমন্ত্রণে তার গোবিন্দগঞ্জের বাসায় দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর পুনরায় ফিরে এসে নৌকা যোগে দ্বিতীয় দফা ত্রাণ বিতরণে বেরিয়ে পড়েন। বাদ মাগরিব পর্যন্ত তিনি এভাবে উপযেলার ছয়ঘরিয়া, শ্যামপুর-পার্বতীপুর, সন্দেল গুচ্ছগ্রাম, পাড়-সন্দেল গুচ্ছগ্রাম, মালাধর প্রভৃতি গ্রামে ত্রাণ বিতরণ করেন। সন্দেল গুচ্ছগ্রামে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি দেখতে পান যে, জনৈকা মধ্য বয়সী নারী বিস্তীর্ণ ও খরস্রোতা করতোয়া নদীর উত্তর পাড়ের গুচ্ছগ্রাম থেকে খালী হাতে নদী সাঁতরিয়ে এপারের দিকে আসছে। আমীরে জামা'আত দ্রুত নৌকা উত্তর পাড়ের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এটা দেখে মহিলাটি দক্ষিণ পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে পুনরায় উত্তর পাড়ের দিকে সাঁতরাতে শুরু করলেন। তখন সবাই মহিলাটিকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার দিতে শুরু করল। অথচ ত্রাণ নিতে আসা পাশের একটি নৌকা ও কলার ভেলার যাত্রীরা কেউ-ই তার কাছে এগিয়ে গেল না। সবারই লক্ষ্য আগে পৌঁছে ত্রাণ গ্রহণ করা। মহিলাটিকে নিলে তাদের একটি প্যাকেট কমে যাবে।... উত্তর পাড়ে পৌঁছানোর সামান্য পরে মহিলাটি হাসফাস করতে করতে নৌকার কিনারে আসে। তখন আমীরে জামা'আত সর্বপ্রথম তার হাতেই ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেন এবং সঙ্গে নগদ টাকা দেন। যা অন্যদেরকে দেননি। মহিলাটির নাম পারুল বেগম। আমীরে জামা'আত মন্তব্য করলেন, এই সাথে তোমরা ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থার তুলনা কর। সেদিন কেউ কারু কাজে আসবে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। পরবর্তীতে ঈদুল আযহার পরদিন আমীরে জামা'আতের নির্দেশে ঐ মহিলাকে অন্যদের তুলনায় চারগুণ কুরবানীর গোশত ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

এসময় মোট ৫০০ প্যাকেট ত্রাণ বিতরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে রাজশাহী হ'তে ২৭শে আগষ্ট গাইবান্ধা-পূর্বের সাথে আরও ১০০ প্যাকেট ত্রাণ পাঠানো হ'লে যেলা দায়িত্বশীলদের তত্ত্বাবধানে তা উপযেলার কানিপাড়া ও হাতিয়াদহ গ্রামের দুস্থ বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলতামাসুল ইসলাম এবং গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উক্ত ত্রাণ কার্যক্রমে আরও উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম, স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-আওন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, গাইবান্ধা -পশ্চিম ও পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। গাইবান্ধা-পূর্বের সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সেক্রেটারী অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামও ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

এভাবে পাঁচশতাধিক বন্যাদুর্গত পরিবারের মধ্যে দিনব্যাপী ত্রাণ বিতরণ শেষে রাত ৮-টায় গোবিন্দগঞ্জ টিএ্যাণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিব-এশা জমা ও ক্বছর শেষে আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রাত ১-টায় রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ২৭শে আগষ্ট রবিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে চলমান ত্রাণবিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে অদ্য গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা উপযেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকাল ৭-টায় রাজশাহী হ'তে রওয়ানা হয়ে বেলা ১২টায় যেলার সাঘাটা থানাধীন জুমারবাড়ী বাজার থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তরে সাঘাটা টেকনিক্যাল স্কুল এণ্ড কলেজ সংলগ্ন থৈকরের পাড়া খেয়াঘাটে পৌঁছেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীরা এবং অন্যান্য সুধীবৃন্দ আমীরে জামা'আতকে স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য, পূর্বেই ট্রাক হ'তে ৫০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী আনলোড করে বড় দু'টি নৌকায় উঠিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়। অতঃপর সাথীদের নিয়ে আমীরে জামা'আত বড় বড় দু'টি নৌকায় রওয়ানা হয়ে সোয়া এক ঘণ্টা চলার পর বিশাল যমুনা নদীর মাঝখানে চারিদিকে অথৈ পানিবেষ্টিত প্রত্যন্ত চরাঞ্চল হলদিয়া ইউনিয়নের গারামারা এলাকায় পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে জীর্ণ টিনের মসজিদে জামা'আতের সাথে তিনি যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন। অতঃপর নৌকার মধ্যে রোদে দাঁড়িয়ে পূর্বে কৃত তালিকা অনুযায়ী অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে গারামারা, কানাইপাড়া ও আশপাশের গ্রাম সমূহ থেকে আগত বানভাসিদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রীর প্যাকেট সমূহ বিতরণ করেন। ত্রাণ বিতরণকালে তিনি অনেকের গলার তাবীয, হাতের বালা ইত্যাদি খুলে দেন এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। তিনি আসন্ন ঈদুল আযহায় এই চরের অধিবাসীদের মধ্যে কুরবানীর গোশত বিতরণের এবং সময়সাপেক্ষে কিছু নলকূপ বসানোরও আশ্বাস দেন।

গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উক্ত ত্রাণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় দাঈ শরীফুল ইসলাম (বাহরাইন), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সিঙ্গাপুরের সহ-সভাপতি মো'আযযম হোসাইন, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুর রহীম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম হোসাইন এবং গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ।

এ সময় প্রায় চার শতাধিক দুর্গত পরিবারের মধ্যে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট শতাধিক ত্রাণের প্যাকেট পরদিন উপযেলার ভরতখালী ও পাতিয়ারপুর (কচুয়া) গ্রামে যেলা দায়িত্বশীলদের তত্ত্বাবধানে বিতরণ করা হয়।

কুলাঘাট-লালমণিরহাট ও ভুরুঙ্গামারী-কুড়িগ্রাম ২৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সোয়া ৬-টায় দারুল ইমারত নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাইক্রো যোগে লালমণিরহাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বগুড়ার চারমাথায় সকাল সাড়ে ৮-টায় বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীন সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে একটি হোটেলে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বেলা দেড়টায় লালমণিরহাট যেলার কুলাঘাট ইউনিয়নের দক্ষিণ শিবের কুঠি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। এ সময় তিনি গত শীত মৌসুমে শীতবস্ত্র বিতরণে এখানে আসতে পুলিশী বাধার কথা স্মরণ করেন এবং এবারে বন্যাত্রাণ বিতরণে বাধা না দেওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

এ সময় যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর ফেরীতে ধরলা নদী পার হয়ে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী থানাধীন ধাউড়ার কুঠি গ্রামে বিকাল ৫-টা ৫০ মিনিটে পৌঁছেন। এখানে তিনি বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। সমবেত লোকজনদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এ সময় কুড়িগ্রাম-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি ভুরুঙ্গামারী থানাধীন আন্দারীঝাড় গ্রামের মুস্তাফীযুর রহমানের বাড়ীতে যাত্রা বিরতি করেন এবং বাদ মাগরিব দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর রাত সোয়া ৮-টায় তিনি কুড়িগ্রাম হয়ে রংপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রচণ্ড যানজটের মধ্যে রাত ১-টায় রংপুর শহরের পার্ক মোড়স্থ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে অপেক্ষমাণ কর্মীদের সাথে মিলিত হন। ঐ গভীর রাতে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি আমরা আল্লাহ্র বিধান মানার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করি, তাহ'লে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি মূসা (আঃ)-কে তার কওমের কষ্টদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ছবর ও ইয়াক্বীনের মাধ্যমে দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র বিশুদ্ধ দাওয়াতে বাধা ও কষ্ট দুই-ই রয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক। আন্দোলন পরিচালনার জন্য চাই একদল দৃঢ়বিশ্বাসী ও দৃঢ়চিত্ত নেতা ও কর্মী। আমাদেরকে আল্লাহ তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, এই দো'আ করি।

অতঃপর এখানে রাতের খাবার শেষে রাত সোয়া ২-টার দিকে তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পরদিন সকাল পৌনে ৮-টায় রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

এই সফরে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল ইসলাম, আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের প্রধান আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-'আওন (নিরাপদ রক্তদান সংস্থার) সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের আইটি সহকারী জিএম ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ্য এই সফরে লালমণিরহাটে কুলাঘাট, মহিষখোচা ও ছিটমহল এলাকায় ৩৮০ এবং কুড়িগ্রামে ৫৩০ মোট ৯১০ টি ত্রাণের প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

ত্রাণ বিতরণের অন্যান্য রিপোর্ট

বিরল, দিনাজপুর ১৬-৩১শে আগষ্ট : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম যেলার বিরল উপযেলার উদ্যোগে যেলা সদর, বিরল ও বোচাগঞ্জ উপযেলার বিভিন্ন গ্রামের বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ১৬ই আগষ্ট হ'তে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে মোট ৮দিন এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়। যেলার সদর থানার লালবাগ, ভালুয়াডাঙ্গা, কাঞ্চন কলোনী; বিরল উপযেলার কামদেবপুর, কৈকুরী, বহইল, নোনাগ্রাম, খোপড়াগ্রাম, ভাড়াডাঙ্গী, বালান্দোর, বুড়িরহাট, ধর্মপুর, কালীয়াগঞ্জ, দ্বীপনগর, হোসনা, ঝাড়পুকুর, মাড়পুকুর, বড় পুকুর, ফতেশিং, যশোরাল, বানিয়াপাড়া, মোখলেছপুর, বহলা, বেনীপুর, শাকৈর, পালাশবাড়ী, ভুতিগাঁও, দত্তপাড়া, ধোলাতৈর, কুকুরিবন এবং সেতাবগঞ্জ উপযেলার পাঁচপাড়া, তেতেড়া প্রভৃতি গ্রামে ত্রাণ হিসাবে প্রথমদিকে শুকনা খাবার এবং শেষের দিকে চাউল, ডাল, লবন, তেল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় সহযোগিতা এবং স্থানীয় রূমানা অটো রাইস মিলের

মালিক রকীবুল হাসান ও ইলিশ এগ্রো-এর মালিক আব্দুছ ছামাদ সহ অন্যান্য দাতাদের সহযোগিতায় মোট ১ লক্ষ ৭৯ হাযার ৫০৯ টাকার ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ বিতরণ কাজে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাশেদুল আলম, বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওছমান গণী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করীম, কাযীপাড়া এলাকা সভাপতি মাষ্টার আব্দুছ ছবূর, যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন, বিরল উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল লতীফ সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মান্দা, নওগাঁ-পূর্ব ২৭শে আগষ্ট রবিবার : অদ্য যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে যেলার মান্দা থানার চকরামপুর, পার শিমলা, ফতেপুর, নূরুল্লাবাদ, চককানু গ্রামের বানভাসি একশ' পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমান ও যেলা 'আল-আউন'-এর সভাপতি ডা. শাহীনুর রহমান প্রমুখ।

বন্যার্তদের মাঝে কুরবানীর গোশত বিতরণ : পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন যেলার বন্যাদুর্গত পরিবারের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে মোট ১৬টি গরু ও ৬টি খাসি কুরবানী করা হয়। এর মধ্যে গাইবান্ধা-পশ্চিমে ৩টি গরু, গাইবান্ধা-পূর্বে ৪টি গরু, জামালপুর-উত্তরে ২টি গরু ও ১টি খাসি, জামালপুর-দক্ষিণে ২টি গরু, লালমণিরহাটে ২টি গরু, কুড়িগ্রাম-উত্তরে ১টি ও কুড়িগ্রাম-দক্ষিণে ১টি গরু, রাজশাহীতে ১টি গরু, বগুড়ায় ৪টি খাসি এবং মেহেরপুরে ১টি খাসি। এসব কুরবানী বাবত ব্যয় হয় মোট ৯ লক্ষ ১৬ হাযার টাকা। গোশত বিতরণ করা হয় মোট ১৯৩৪টি পরিবারের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, আসন্ন ঈদুল আযহায় বন্যাদুর্গত পরিবার সমূহের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করার লক্ষ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জুম'আর খুৎবায় আবেদন জানালে দেশ-বিদেশের অনেক দ্বীনি ভাই এতে সাড়া দেন। এমনকি কেউ কেউ নিজের কুরবানী না দিয়ে বন্যার্তদের জন্য তা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন।

[আমরা সকল দাতা ভাইদের জন্য মহান আল্লাহ্র বারগাহে খাছ দো'আ করি, তিনি যেন সকল দাতা ভাই-বোনদেরকে এর পূর্ণ নেকী দান করেন-আমীন -সম্পাদক]

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে আমীরে জামা'আত

নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখুন!

-বিশ্ববাসীর প্রতি আমীরে জামা'আত

হোয়াইকং, টেকনাফ ৯ই সেপ্টেম্বর'১৭ শনিবার : অদ্য দুপুর ১-ঘটিকায় কক্সবাজার যেলার টেকনাফ থানাধীন হোয়াইকং বাজারস্থ উত্তম কমিউনিটি সেন্টারে মিয়ানমার থেকে সদ্য আগত নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণকালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

কক্সবাজার যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানের শুরুতে আমীরে জামা'আতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সদ্য আগত নির্যাতিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্য থেকে পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরক্বান ৬১-৬৬ আয়াত তেলাওয়াত করেন, ৭ সদস্যের পরিবারের ৫জনকে হারানো সেদেশের একটি জামে মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়াস। অতঃপর শরণার্থীদের মধ্য থেকে তাদের অবস্থা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন আরাকানের মংডু থানাধীন মেরুল্লা গ্রামের মুহাম্মাদ বশীর আহমাদ, পুরমা গ্রামের আবু মিয়া ও ফাতেমা এবং কেয়ারীপাড়া গ্রামের রহীমা। তারা যখন তাদের উপর নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন, তখন উপস্থিত সকলের চক্ষু ভিজে ওঠে।

অতঃপর যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, হোয়াইকং বাজার কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ আলমগীর চৌধুরী, কক্সবাজার মুনীরিয়া বাহরুল উলূম আলিম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল আউয়াল (৭১)।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর স্বভাবসূলভ ওজস্বিনী ভাষায় ব্যথিত কণ্ঠে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি নির্যাতিত রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, ভিটে-মাটিহারা, পরিবারহারা, সম্পদহারা, সম্ভ্রমহারা ও সর্বস্বহারা মানুষগুলিকে সামনে পেয়ে আমরা আমাদের জীবনের সকল মায়া-মমতা ভুলে গেছি। আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বাংলার এ স্বাধীন মাটিতে। আমরা আপনাদের সাথে আছি, ইনশাআল্লাহ থাকব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। আপনারা মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ ব্যতীত বান্দাকে সাহায্য করার কেউ নেই। তিনি বলেন, বিশ্বনেতাদের যে অবস্থা তাদের কাছে আমাদের কিছুই বলার নেই। আল্লাহপাক যদি মেহেরবানী করে কোন ভেটোধারী নেতার অন্তর এদিকে ঘুরিয়ে দেন, তখনই দ্রুত একটা পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। যে আল্লাহ্র হাতে মানুষের অন্তর তার কাছেই আমরা প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের অন্তরগুলিকে এই সমস্ত দুস্থ ও নির্যাতিত মানুষগুলোর দিকে ফিরিয়ে দাও। তিনি দুঃখ করে বলেন, আজকে নাফ নদীতে মানবতা ভাসছে। অথচ হতভাগা বিশ্বনেতারা চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর বিশ্বকে গণতন্ত্রের সবক দিচ্ছে। ধিক ঐসব নেতাদের।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, বার্মায় বৌদ্ধ আগমনের দেড় শতাধিক বছর পূর্বে মুসলমানের আগমন ঘটেছে। তৎকালীন আরাকান রাজ্য ছিল ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত। যা ছিল রাহমী রাজার অধিকার ভুক্ত। যিনি মুসলমানদের নবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে আদাভর্তি কলস পাঠিয়েছিলেন মদীনাতে *(হাকেম ৪/১৩৫)*। যে রোহিঙ্গারা একদিন আমাদের নবীকে সম্মান করে আদা উপঢৌকন পাঠিয়েছিল, আজ তারাই সর্বস্ব হারিয়ে আমাদের মেহমান। আমরা কি তাদের সম্মান করবো না?

তিনি বলেন, বৌদ্ধদের আদিনিবাস হ'ল ভারতে। সেখান থেকে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজাদের হাতে নির্যাতিত ও বিতাড়িত হয়ে তারা ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের পরে তিব্বত, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়। ভারত এখন প্রায় বৌদ্ধশূন্য বলা চলে। অথচ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। এটি ইসলামের উদারনীতির ফল। ইনশাআল্লাহ এই নীতি সর্বদা বহাল থাকবে। তিনি বলেন, পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। এ মাটিতে তার যেকোন বান্দা, যেকোন স্থানে বসবাস করার স্বাধীন অধিকার ভোগ করবে। কোন মাটিতে কে আগে আসলো, কে পরে আসলো এটা দেখার বিষয় নয়। ইসলামের এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতি বিশ্ব মানবতার রক্ষাকবচ।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করে বলেন, ব্রিটিশরা যদি ১৯৩৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আরাকান রাজ্যকে বার্মার সঙ্গে যুক্ত করে না

দিত, তাহ'লে আজকে এই রক্ত ঝরতো না। ঠিক যেমন ১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কাশ্মীরকে ভারতের সাথে যুক্ত করে দিয়ে স্থায়ী রক্ত ঝরার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। তিনি নির্যাতিত মানবতার প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবী জানান।

তিনি নির্লিপ্ত বিশ্বনেতাদের বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাধারী নেতাদের উদ্দেশ্যে কিছু অংশ ইংরেজীতে ও কিছু অংশ আরবীতে বক্তব্য রাখেন এবং নিজ দুশ্চরিত্র কওমের প্রতি লূত (আঃ)-এর শ্লেষাত্মক আহ্বান উদ্ধৃত করে বলেন, أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 'তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল লোক নেই?' *(হূদ ১১/৭৮)*। তিনি বলেন, সুদূর তুরস্ক থেকে তাদের ফার্ষ্ট লেডী গত পরশু কুতুপালং ঘুরে গেলেন, অথচ ঢাকা থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখনও আসেননি। অতঃপর ভাষণের শেষাংশে তিনি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র কাছে সোচ্চার আবেগে দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ *'আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম'* (হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে বর্মী দস্যুদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। এসময় অনুষ্ঠানে কান্নার রোল পড়ে যায়।

অতঃপর তিনি খাদ্যবস্তু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মোট ২০টি আইটেম সমৃদ্ধ ত্রাণের প্যাকেট সমূহ শরণার্থীদের হাতে তুলে দেন। যার মধ্যে ছিল- চাউল, ডাল, মুড়ি, চিড়া, সোয়াবিন তেল, চিনি, বিস্কুট, চানাচুর, পাউরুটি, পানি, প্লেইট, গ্লাস, চেরাগ, লাইটার, সাবান, ত্রিপল, স্যালাইন, প্যারাসিট্যামল ও ফ্লাজিল ট্যাবলেট।

অনুষ্ঠানের শেষে মাননীয় সভাপতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সংগঠনের কর্মীদের এবং স্থানীয় সুধী ও তরুণদের ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠ অন্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[বিস্তারিত দ্রঃ সম্পাদকীয় 'রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কাম্য' (১৫/১০ সংখ্যা, জুলাই ২০১২; দিগদর্শন-২ পৃ. ২৪৬-২৫২)। জুম'আর খুৎবা ১৮ই নভেম্বর'১৬ এবং মানববন্ধনের বক্তব্য ১৭ই ডিসেম্বর'১৬। উক্ত অনুষ্ঠানের পূর্ণ ভিডিও দেখুন : www.multimedia.ahlehadeethbd.org]

অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে ক্বিবলার দিকে দেওয়ালে আরবীতে ডান পাশে 'আল্লাহ' ও বাম পাশে 'মুহাম্মাদ' এবং উভয়ের মাঝে কালেমায়ে শাহাদাত লিখিত দীর্ঘ টাইল্স দেখে আমীরে জামা'আত মসজিদ কমিটির নেতাদের খোঁজ করেন। তখন বাজার কমিটির সভাপতি আলমগীর চৌধুরী এগিয়ে এলে তিনি বিষয়টির আক্বীদাগত ভ্রান্তির দিকটি তাকে বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' 'কালেমা' ইত্যাদি আমাদের বিশ্বাসের বস্তু। এগুলি কোন সাইনবোর্ডের বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় মসজিদে নববীতে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতএব মসজিদ জাঁকজমকপূর্ণ করা সহ নবউদ্ভূত বিষয় সমূহ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, লিখিত টাইল্সগুলি উঠিয়ে সাদা টাইল্স দিয়ে স্থানটি ভরে ফেলাই উত্তম হবে। তিনি সাথে সাথে সেটি মেনে নেন। এছাড়াও মসজিদের বাইরে ক্বিবলার দিকে উত্তর কোণে একটি বাঁধাই করা সুসজ্জিত কবর দেখে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ওটা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আমার বড় ভাইয়ের কবর। আমীরে জামা'আত তাকে কবর ও মসজিদের মাঝে একটি উঁচু দেওয়াল নির্মাণের পরামর্শ দেন এবং ভবিষ্যতে মসজিদের সামনে বা পার্শ্বে কোন কবর না দেওয়ার উপদেশ দেন। অতঃপর যোহর ও আছর জমা ও ক্বছর শেষে তিনি বাজার কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ত্রাণ কার্যে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বিশেষ করে রাসেল ও তার তরুণ বন্ধুদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন। তিনি 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'আত-তাহরীক' পাঠের খবরে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

হোয়াইকং বাজারের আনুষ্ঠানিকতা সেরে টেকনাফের পথে রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত সীমান্তবর্তী লম্বা বিল পয়েন্টে গমন করেন এবং সেখানে সদ্য আগত রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের মাঝে বৃষ্টির মধ্যে ত্রাণের কিছু প্যাকেট ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন। এখানে কর্মীরা ট্রাক বোঝাই বড় বড় ৫০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রীর বাকীগুলি বিতরণ করেন। অতঃপর ত্রাণবাহী খালি ট্রাক কক্সবাজার ফিরে যায়।

এরপর সেখান থেকে টেকনাফ যাওয়ার পথে নাফ নদী পেরিয়ে সদ্য আগতদের সারির মাঝে তিনি ও তাঁর সাথীগণ পরিবার ও ব্যক্তি বুঝে ১০০, ৫০০, ১০০০ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করতে থাকেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নতুন আগতগণ ত্রাণ নিতে হাত বাড়ান না। তাদেরকে একপ্রকার জোর করেই দিতে হয়। চরম কষ্টের মধ্যেও হাত না পাতার শিক্ষা তাদের মহান ইসলামী ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের নাম আরবী ভাষায়। নিজেদের রোহাং ভাষায় নয়। নিঃসন্দেহে এটি তাদের ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের অতুলনীয় নিদর্শন। বস্তুতঃ স্রেফ ইসলামের কারণেই তারা আজ কাফেরদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার।

অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সাথীগণ কক্সবাজারের নতুন আহলেহাদীছ ভাই ডা. নূরুল ইসলামের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। যিনি ইতিমধ্যে ২০ কপি 'আত-তাহরীকে'র এজেন্ট। অতঃপর সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিদায় হয়ে মেরিন ড্রাইভ সড়ক দিয়ে রাত ৮-টার দিকে তিনি কক্সবাজার ফিরে আসেন। ফেরার পথে সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

দিন ব্যাপী এই ত্রাণ কর্মসূচীতে আমীরে জামা'আতের সাথে ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরমান, দফতর সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ, স্থানীয় সুধী মাওলানা আব্দুল আউয়াল ও মুহাম্মাদ রেযাউল করীম এবং সাতকানিয়ার মাওলানা মোর্তযা প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, সফরসঙ্গী ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন পরদিন কুতুপালং সীমান্তে পুনরায় ত্রাণ বিতরণে গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে রাতের কোচে চট্টগ্রাম এসে আমীরে জামা'আতের সাথে মিলিত হন।

ত্রাণ বিতরণের খবর পরদিন কক্সবাজারের স্থানীয় আমাদের কক্সবাজার, দৈনিক আজকের দেশ-বিদেশ, দৈনিক সেঞ্চুরী, দৈনিক কক্সবাজার বাণী, দৈনিক সকালের কক্সবাজার, দৈনিক কক্সবাজার, দৈনিক রূপালী সৈকত পত্রিকায় ছবিসহ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বেশ কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায়ও প্রচারিত হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ২৫ শে আগষ্ট নতুনভাবে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে এবং কক্সবাজার যেলা সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় সদ্য আগত নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে গত ৩১শে আগষ্ট থেকে ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়ে নিয়মিতভাবে চলমান আছে এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

[বর্মী সরকারের নির্যাতনে স্রোতের মত আগত অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবারগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত জুম'আর খুৎবায় আবেদন জানালে দেশ-বিদেশের অনেক দ্বীনি ভাই এতে সাড়া দেন। আমরা সকল দাতা ভাই-বোনের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে খাছ দো'আ করছি, তিনি যেন সকলকে ইহকালে ও পরকালে এর উত্তম জাযা দান করেন -আমীন। -সম্পাদক]

কক্সবাজার সফরের অন্যান্য সংবাদ

কক্সবাজার ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুম'আর খুৎবা : রাজশাহী থেকে আগের দিন বৃহস্পতিবার বিমান যোগে ঢাকা এসে পরদিন ড. সাখাওয়াত হোসাইনকে সাথে নিয়ে আমীরে জামা'আত বিমান যোগে বেলা সাড়ে ১১-টায় কক্সবাজার পৌঁছেন। সেখানে যেলা সভাপতি সহ অন্যান্যগণ তাঁদের স্বাগত জানান। অতঃপর তাঁরা হোটেল লাইট হাউজের নির্ধারিত কক্ষে ব্যাগ-পত্র রেখে ওযূ সেরে নব নির্মিত পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। অতঃপর আমীরে জামা'আত জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় তিনি কক্সবাজার শহরে সর্বপ্রথম নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দানের সুযোগ লাভে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। ইন্টারনেটে খবর জানতে পেয়ে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত পর্যটকরা জুম'আয় উপস্থিত হন। যারা ছালাত শেষে আবেগভরে কুশল বিনিময় করেন এবং এখানে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণভরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।

খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত মুছল্লীদেরকে স্ব স্ব জীবনের সফরসূচী স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, মানুষের জীবনে একটা সময় ছিল যখন সে কিছুই ছিলনা। মহান আল্লাহই তাকে মায়ের গর্ভে রূহ ফুঁকে দেন ও চার মাস বয়সে তার তাক্বদীর লিখে দেন। অতঃপর দুনিয়াতে শৈশব-কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য পেরিয়ে আবার সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হয়। এই দীর্ঘ সফরসূচীর রূপকার ও নিয়ন্ত্রক যিনি, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। অতএব আমাদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। আর তা অবশ্যই তাঁর প্রেরিত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিখানো ও দেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে। মানব রচিত কোন ভ্রান্ত পদ্ধতিতে নয়। তিনি মুছল্লীদের নিকট নির্যাতিত ও সর্বস্বহারা রোহিঙ্গা মুসলমানের সোনালী অতীত তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী এই সকল অসহায় ভাই-বোনদের সহযোগিতায় উদারহস্তে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সুধী সমাবেশ : একইদিন বাদ এশা উক্ত মসজিদে কক্সবাজার যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহাতারাম আমীরে জামা'আত দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের সাগর বিধৌত পর্যটন নগরী কক্সবাজারে 'আন্দোলন'-এর কর্মী ও সাথী ভাইদের দাওয়াতী ও সামাজিক কর্মতৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাদের জন্য খাছ দো'আ করেন। এ সময়ে তিনি সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং দায়িত্বশীলদেরকে নব নব ফিৎনা ও ধোঁকাসমূহ থেকে দূরে থেকে স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত দাওয়াত সর্বমহলে পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান।

যেলা গঠন : অতঃপর পৃথক স্থানে সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ২০১৭-২০১৯ সেশনের জন্য কক্সবাজার যেলার নতুন কর্ম পরিষদ প্রস্তাব করেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অনুমোদনক্রমে সেটি সুধী সমাবেশে ঘোষণা করেন। পরে 'কর্মীদের গুণাবলী'র উপরে নাতিদীর্ঘ ভাষণ শেষে আমীরে জামা'আত তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন ও তাদের সার্বিক সাফল্যের দো'আ করেন।

চট্টগ্রাম ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার : কক্সবাজার সফর শেষে পরদিন সকাল সাড়ে ৯-টার কোচ যোগে আমীরে জামা'আত কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বেলা আড়াইটায় চট্টগ্রাম পৌঁছলে সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শেখ সা'দী ও প্রচার সম্পাদক আছিফুল ইসলাম। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও উত্তর পতেঙ্গাস্থ নব নির্মিত বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স -এর জমিদাতা জনাব আব্দুশ শুকূর-এর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

সুধী সমাবেশ : ১০ তারিখ বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আত নির্মাণাধীন উক্ত মসজিদে চট্টগ্রাম যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছের বিশুদ্ধ আক্বীদা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আক্বীদাগত বিভ্রান্তির কারণেই আজ কেউ চরমপন্থী হচ্ছে, কেউ শৈথিল্যবাদী হচ্ছে। অথচ এর কোনটিই সঠিক আক্বীদা নয়, বরং সঠিক আক্বীদা হ'ল আহলেহাদীছের মধ্যবর্তী আক্বীদা। তিনি সকলকে আমল বিশুদ্ধ করার সাথে সাথে আক্বীদা বিশুদ্ধ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, পাঁচ তলা ভিতের উক্ত জামে মসজিদের চার তলার ছাদ দেওয়া হয়েছে। নীচ তলা মেয়েদের এবং দো'তলা ও তিন তলা পুরুষ মুছল্লীদের ছালাত চলছে। সামনের মার্কেটটি ভেঙ্গে সেখানে বহুতল মাদরাসা, হেফযখানা, ইয়াতীমখানা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হবে। মসজিদের বহু কাজ বাকী রয়েছে। যা দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের অর্থ সাহায্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। পুরা কমপ্লেক্সটি 'ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহী'-এর নামে ঘোষণাকৃত এবং তার অনুমোদিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত। আমীরে জামা'আত ৩০শে অক্টোবর'১৫ জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে অত্র মসজিদ উদ্বোধন করেন।

অফিস উদ্বোধন : সুধী সমাবেশ শেষে আমীরে জামা'আত বায়তুর রহমান জামে মসজিদ সংলগ্ন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম যেলা কার্যালয় উদ্বোধন করেন। উক্ত মসজিদের খত্বীব ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর প্রশিক্ষণ সম্পাদক শামসুল আলম কর্তৃক কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণীর পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি কর্মীদেরকে দাওয়াতী কাজ আরও যোরদার করার আহ্বান জানান।

যেলা গঠন : অতঃপর তিনি সদস্যদের পরামর্শক্রমে আগামী ২০১৭-২০১৯ সেশনের জন্য চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন করেন। অতঃপর দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক রাজধানীতে দাওয়াতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ও থানায় পৃথক পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে 'আন্দোলন'কে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন : কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে চারদিনের সফর শেষে পঞ্চম দিন ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গী সহ চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হ'তে পূর্বাহ্নে বিমান যোগে ঢাকা, অতঃপর ঢাকা থেকে অপরাহ্নে রওয়ানা হয়ে বিকাল ৪-২০ মিনিটে রাজশাহী বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

Contents

যুবসংঘ

যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব)

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ ও ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের ৪র্থ তলায় রংপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের যেলাসমূহের দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে দু'দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সোনামণি'র কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

নওদপাড়া, রাজশাহী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আন্দোলন'-এর আমেলা সদস্যবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে ২০১৭-২০১৯ সেশনের জন্য 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ মনোনয়ন দেন। অতঃপর সকাল ৯-টায় অনুষ্ঠিত সোনামণি সম্মেলনে নবমনোনীত কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নাম ঘোষণা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। পরিচালনা পরিষদের নাম :

দায়িত্ব	নাম
পরিচালক	মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী)
সহ-পরিচালক-১	রবীউল ইসলাম (নওগাঁ)
সহ-পরিচালক-২	যয়নুল আবেদীন (দিনাজপুর)
সহ-পরিচালক-৩	আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া)
সহ-পরিচালক-৪	হাবীবুর রহমান (রাজশাহী)
সহ-পরিচালক-৫	আবু হানীফ (নওগাঁ)

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম-এর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। গত ২৭শে আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৪৭২তম সিণ্ডিকেট সভায় তাঁর এই ডিগ্রি অনুমোদিত হয়। তাঁর পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম ছিল **'আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত : আরবী প্রবন্ধে তাঁর অবদান'**। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এস. এম. আব্দুস সালাম এবং পরীক্ষক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ বদীউর রহমান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ যাকির হুসাইন। তিনি রাজশাহী মহানগরীর শাহ মখদুম থানাধীন বড়বনগ্রাম (ভাড়ালীপাড়া) নিবাসী জনাব ঈমান আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সকলের দো'আপ্রার্থী।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত 'কাযী হজ্জ কাফেলা' এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বিভিন্ন প্যাকেজে হজ্জ ও ওমরাহ্র বুকিং চলছে

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : আমার পূর্বে ক্রয়কৃত পিয়ানো ও গিটার আছে। দ্বীন বুঝার পর এখন সেগুলি বিক্রি করে ইসলামী বই ক্রয় করতে চাই। এরূপ করা জায়েয হবে কি? নতুবা সেগুলি নিয়ে করণীয় কি?

-রূহুল আমীন, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এগুলো বিক্রয় করে উপকৃত হওয়া যাবে না। কারণ এগুলি হারাম কাজের উদ্দেশ্যে তৈরী। অতএব এগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক মশক শরাব হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানাকানি করল। রাসূল (ছাঃ) সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে গোপনে কি বললে? সে বলল, আমি তাকে তা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন। তিনি তার বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, এরপর সে মশকের মুখ খুলে দিল এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল *(মুসলিম হা/১৫৭৯; ছহীহুল জামে' হা/১৬৮৯)*।

প্রশ্ন (২/২) : মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার প্রচ্ছদে সুন্দর সুন্দর মসজিদের ছবি দেওয়া হয়। অথচ আমরা জানি যে, মসজিদ সৌন্দর্য মণ্ডিত করা ক্বিয়ামতের আলামত। তাহ'লে কি আত-তাহরীক মসজিদ সুন্দর করতে উৎসাহিত করছে?

-রেযওয়ান, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বিভিন্ন পত্রিকায় অসুন্দর ছবি সমূহের বিপরীতে এটি সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি মাত্র। আত-তাহরীক এগুলোর মাধ্যমে মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে উৎসাহিত করে না। বরং এর উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মসজিদগুলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং মানুষকে মসজিদের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। স্মর্তব্য যে, মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা জায়েয। ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৪৪৬, ১/৬৪৩)*। কিন্তু অতিরঞ্জিতভাবে জাঁকজমকপূর্ণ করা যাবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা একে জাঁকজমকপূর্ণ করবে যেভাবে ইহূদী-নাছারাগণ করত *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৪৯; মিশকাত হা/৭১৯)*। অতএব মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে মুছল্লীদের একাগ্রতা বিনষ্ট করতে পারে এরূপ সুসজ্জিত নকশা ও কারুকার্য থেকে বেঁচে থাকা যরূরী *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭-৫৮)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : কাতারের সম্মুখে মশার কয়েল জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এতে কি অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য হবে?

-ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারী
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এভাবে ছালাত আদায় করা যাবে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না এবং এটি কারো সাথে সাদৃশ্যপূর্ণও হবে না। কারণ কয়েল বা হারিকেন পূজা করার জন্য জ্বালানো হয় না। আর বান্দার সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল *(বুখারী হা/১)*। রাসূল (ছাঃ) সূর্যগ্রহণের ছালাতে জাহান্নামের আগুন দেখেছেন অথচ ছালাত ত্যাগ করেননি *(বুখারী হা/১২১২)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াতে ছিয়াম রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া সূরা ইনশিক্বাক্বের ১৬-১৭ আয়াতে আল্লাহ সন্ধ্যা ও রাতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। সেকারণ সূর্যাস্তের পর নয়; বরং তার ১ ঘণ্টারও অধিক সময় পর রাত শুরু হ'লেই ইফতার করতে হবে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। উক্ত আয়াতদ্বয়ে সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পর ইফতার করার কোন দলীল নেই। কেননা ইফতারের সময়ের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল, যখন এই (পূর্ব) দিক হ'তে রাত্রি আগমন করবে, আর এই (পশ্চিম) দিক হ'তে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য অস্ত যাবে, তখনই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪, মিশকাত হা/১৯৮৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'বিবিধ মাসায়েল' অনুচ্ছেদ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় আমরা তাঁর সাথে সফরে বের হ'লাম। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন, তুমি নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। এভাবে তিনবার বলার পর তিনি ছাতু গুলে আনলে রাসূল (ছাঃ) আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন, যখন তোমরা এদিক থেকে রাত এগিয়ে আসতে দেখবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে *(বুখারী হা/১৯৫৬)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'লোকেরা ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। বস্তুতঃ সূর্যাস্তের পর থেকেই রাত্রি শুরু হয়।

প্রশ্ন (৫/৫) : রাসূল (ছাঃ) হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফায় খোলা আসমানের নীচে হজ্জ পালন করেছেন, যদিও সেসময় ছাউনি বা ঘর বানানোর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেখানে ঘর, এসি, ফ্যান ইত্যাদি আরামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে কি?

Contents

-মুহাম্মাদ গুলযার হোসাইন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এতে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না। আর প্রয়োজনমত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কোন বাধা নেই। বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আরাফা ময়দানের নামেরায় তাঁবু খাটানো হয়েছিল *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : সফরে ৩ জনে মিলে কুরবানী করলে গোশত কি ৩ ভাগ না ৭ ভাগ করতে হবে?

-শারাফাত, ঢাকা।

উত্তর : সফরে ৭ ভাগই করতে হবে। কারণ ভাগা কুরবানী সম্পর্কিত হাদীছসমূহে গরুতে সাত ও উঁটে দশভাগের কথা বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/১৩১৮; মিশকাত হা/১৪৫৮)*। সাতের নীচে ভাগের কোন দলীল পাওয়া যায় না। শায়েখ উছায়মীন বলেন, যদি একটি কুরবানীতে দু'জন শরীক হয় তা জায়েয হবে না।... অনুরূপ কেউ যদি অর্ধভাগ গ্রহণ তার কুরবানীও শুদ্ধ হবে না। কারণ এটি একটি ইবাদত যা শারঈ পন্থায় হ'তে হবে *(রাসায়েলে ফিক্বহিয়্যাহ ১/৫৮-৫৯)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : মানবদেহের পশম কাটায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? যেমন হাত, বুক বা পিঠের পশম বেশী বড় হওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রুবেল, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : দেহের পশম কষ্টদায়ক হ'লে কাটা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে যা হালাল করেছেন তা-ই বৈধ এবং যা হারাম করেছেন তা-ই অবৈধ। আর তিনি যে সকল বিষয়ে নীরব থেকেছেন (বৈধ বা অবৈধ কিছুই বলেননি) তা তাঁর ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত *(তিরমিযী হা/১৭২৬; মিশকাত হা/৪২২৮; ছহীহুল জামে' হা/৩১৯৫)*। যেহেতু শরী'আতে দেহের পশম কাটার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি, সেহেতু এটা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/১৯৪; ফাতাওয়াউল মারআতিল মুসলিমা ৩/৮৭৭-৮৭৯)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : তিন ভাই তাদের স্ত্রী-সন্তান সহ একত্রে বসবাস করে। প্রত্যেকের উপার্জন পৃথক। তবে একসাথেই রান্না-বান্না হয়। এক্ষণে যৌথ পরিবারে থাকার কারণে একটি কুরবানীই কি যথেষ্ট হবে? এক্ষেত্রে কুরবানী করার সময় কোন ভাইয়ের নাম বলবে?

-আব্দুল কাইয়ূম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : একটি কুরবানীই যথেষ্ট হবে। একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট হবে *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২৫/৭)*। এক্ষেত্রে পরিবার প্রধানের নাম ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে বলবে।

প্রশ্ন (৯/৯) : কায়িক শ্রমরত ঘর্মাক্ত শ্রমিক ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে সময়স্বল্পতার কারণে কেবল ওযূ করে ছালাতে যোগদান করতে পারবে কি, না গোসল করতে হবে?

-ইদ্রীস মিয়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় কেবল ওযূ করলেই যথেষ্ট হবে। কারণ ছালাতের জন্য শর্ত হ'ল ওযূ করা *(মায়েদাহ ৫/৬)*। তবে এমতাবস্থায় গোসল করার সুযোগ থাকলে তা করাই উত্তম হবে। কেননা শরীরে অতিরিক্ত ঘাম থাকলে, তার গন্ধে পাশের মুছল্লী কষ্ট পেতে পারে *(বুখারী হা/৯০২; মুসলিম হা/৮৪৭)*। আর পাশের মুছল্লী কষ্ট পায় এমন কোন কাজ করা যাবে না *(ইবনু হিব্বান হা/২০৯০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : আল্লাহ্র প্রভূত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করে প্রত্যেক ছালাতের পর নিয়মিতভাবে সিজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে কি?

-আশিকুর রহমান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে নিয়মিত সিজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল নতুন নে'মত প্রাপ্ত হ'লে বা কোন বিপদ দূর হ'লে সিজদায়ে শুকুর আদায় করতে হয় *(হাকেম হা/২০১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৮)*। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট খুশির সংবাদ আসলে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০১)*। ছাহাবীগণ থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : মায়ের দিকে নেক নযরে তাকালে কবুল হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-জাহিদ হাসান রাজীব
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : এমর্মের বর্ণনাটি মওযূ বা জাল। কারণ এর একাধিক বর্ণনা সূত্রে অধিকাংশ যঈফ ও অপরিচিত রাবী রয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৯৮; মিশকাত হা/৪৯৪৪)*। তবে পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইসরা ২৩-২৪; তিরমিযী হা/১৮৯৯; নাসাঈ হা/৩১০৪; মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২ প্রভৃতি।

প্রশ্ন (১২/১২) : ঘুম না ভাঙ্গার কারণে সূর্যোদয়ের পর ফজরের ছালাত আদায় করলে সশব্দে কিরাআত করতে হবে কি?

-কামরুল ইসলাম, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : সশব্দে পড়াই উত্তম। রাসূল (ছাঃ)-এর একবার ফজরের ছালাত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পর তিনি অন্যান্য দিনের মতই সশব্দে তা আদায় করেন *(মুসলিম হা/৬৮১; মিশকাত হা/৫৯১১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/১৪০)*। তবে একাকী পড়ার ক্ষেত্রে নীরবে বা সরবে পড়ার বিষয়টি মুছল্লীর ইচ্ছাধীন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৪৭)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : যমযম কূপ ঈসমাঈল (আঃ)-এর পায়ের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে না ফেরেশতা কর্তৃক খননকৃত?

-আলমগীর, পটুয়াখালী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, জিব্রীলের পায়ের গোড়ালি বা ডানার আঘাতে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়েছে *(বুখারী হা/৩৩৬৪-৬৫, 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, ৯ অনুচ্ছেদ)*।

Contents

প্রশ্ন (১৪/১৪) : পিতা-মাতা আমার কল্যাণের জন্য মাযারে ছাগল মানত করেছেন। কিন্তু আমি এতে বিশ্বাস করি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-ইউসুফ আলী, গাযীপুর।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী এজন্য পিতা-মাতা গুনাহগার হবেন, সন্তান নয়। এক্ষণে সন্তানের জন্য কর্তব্য হবে পিতা-মাতাকে উক্ত শিরকী কাজ থেকে ফেরানোর জন্য নছীহত করা। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় মূর্তিপূজারী পিতাকে নছীহত করেছিলেন *(মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : মিসওয়াক করার সময় হাঁটাহাঁটি করা যাবে, না নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এরূপ কোন বিধান আছে কি?

-মুনীরুযযামান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। বরং মানুষকে বেশী বেশী মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন *(মুসলিম হা/২৫৩; মিশকাত হা/৩৭৭)*। তিনি দিনে বা রাতে যেকোন সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে মিসওয়াক করতেন *(আবুদাউদ হা/৫৭; মিশকাত হা/৩৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৫৩)*। এছাড়া প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করতেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : সফর অবস্থায় তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

-শামীম ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : কোন বাধা নেই। বরং সফর অবস্থাতেও তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) সফরে আরোহীর উপরে তাহাজ্জুদ ও বিতর আদায় করতেন *(বুখারী হা/১০০০; মিশকাত হা/১৩৪০)*। তবে ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম প্রহরে বিতরের পর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলে তা রাত্রির নফল ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : দেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে বা বিদেশে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সংবাদ পেলে সূর্য গ্রহণের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাহমূদ, মধ্য বাসাবো, ঢাকা।

উত্তর : যে দেখবে বা যে এলাকায় দেখা যাবে কেবল তারাই সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায় করবে *(নাসাঈ হা/১৪৮৩, ১৫০২; শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩২)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : নবী করীম (ছাঃ) সাপ মারতে বলেছেন। অথচ আল্লাহ বিনা কারণে জীব-জন্তু মারতে নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আব্দুল মোত্ত্বালেব, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিনা কারণে জীব-জন্তু হত্যা করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। কিন্তু যে সকল প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে সেগুলো মারার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সাপ ক্ষতিকর প্রাণী। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাপের ভয়ে সাপ হত্যা করল না, সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ হা/৫২৪৯; মিশকাত হা/৪১৪০)*। তিনি বলেন, 'তোমরা সকল প্রকার সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে পিঠে দু'টি কালো রেখা বিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মারবে। কেননা এ সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়' *(বুখারী হা/৩২৯৭; মুসলিম হা/২২৩৩; মিশকাত হা/৪১১৭)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : হজ্জব্রত পালনকালে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাংখীদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ রাখা যাবে কি?

-মুবীনুল ইসলাম, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : তাদের সাথে যোগাযোগে কোন বাধা নেই। তবে ত্বাওয়াফ ও সাঈ চলাকালীন সময়ে বিরত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ ছালাতের মতই। অতএব তোমরা সেখানে অল্প কথা বল *(নাসাঈ হা/২৯২২; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৫৪)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : হজ্জব্রত পালনকালে মহিলারা অলংকার ব্যবহার করতে পারবে কি?

-নাসরীন, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জ পালনকালে মহিলাদের অলংকার ব্যবহারে কোন বাধা নেই। তবে এ সময় যেন তা পরপুরুষেরা দেখতে না পায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ অলংকার নারী সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/১৯২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২০১)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : আমাদের দেশে ঔষধের গায়ে লেখা থাকে যে, 'শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য'। এক্ষণে দারিদ্রের কারণে যেসব গরীব রোগী ডাক্তার দেখাতে সক্ষম হয় না, তাদেরকে রোগের বিবরণ শুনে ঔষধ দেওয়া দোকানদারের জন্য জায়েয হবে কি?

-আবু সাঈদ, নাটোর।

উত্তর : কোন রোগের ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার যোগ্যতা থাকলেই কেবল সেই রোগের চিকিৎসা দেওয়া যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করে বলেন, যে চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছাড়াই কারো চিকিৎসা করে এবং এর ফলে সে দুর্ভোগে পতিত হয়, তাহ'লে সে এজন্য দায়ী হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৫৮৭; ছহীহাহ হা/৬৩৫)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : নিজস্ব জমিতে মায়ের কবর রয়েছে। এখন সন্তানেরা উক্ত কবর সরিয়ে সরকারী কবরস্থানে দাফন করতে এবং উক্ত জমি বিক্রয় করতে চায়। এটা জায়েয হবে কি?

-আদিল, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : শারঈ প্রয়োজন ব্যতীত কবর স্থানান্তর করা জায়েয নয় *(বুখারী হা/১৩৫১-৪২; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩০৩; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৭৩; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৫/৩৬৯)*। এক্ষণে কবর স্থানান্তরের উদ্দেশ্য যদি কেবল দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিল করা হয়, তবে একাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী।

Contents

প্রশ্ন (২৩/২৩) : জুম'আর দিন অনেকে তাদের মৃত পিতা-মাতার জন্য দো'আ চাইলে ইমাম ছাহেব সূরা ফাতিহা সহ দো'আ-দরূদ পাঠ করে সকলকে নিয়ে সম্মিলিত মুনাজাত করেন এবং সবাইকে সিন্নী খাওয়ানো হয়। এতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুল হাই আল-হাদী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এরূপ কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কারণ এগুলো স্পষ্ট বিদ'আত, যা অবশ্যই বর্জনীয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : ছালাতরত অবস্থায় শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হ'তে দেখলে ছালাত ছেড়ে দিতে হবে কি?

-মোকাম্মাল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : রক্ত বের হওয়ার কারণে ছালাত ছাড়বে না। কেননা রক্ত বের হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। রক্ত বের হ'লে ওযূ করতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারাকুৎনী; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০; মিশকাত হা/৩৩৩)*। বরং বাকর (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তার মুখমণ্ডলে উঠা ফোড়ায় চাপ দিলেন ফলে কিছু রক্ত বের হ'ল। তখন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ঘষে দিলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ওযূ করেননি *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০-এর আলোচনা দ্রঃ)*। যাতুর রিক্বা যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুসলিম বাহিনী পাহারারত ছাহাবী 'আব্বাদ বিন বিশরের উপরে ছালাতরত অবস্থায় পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করা হ'লে তিনি আহত হন এবং প্রচুর রক্তপাত হয়। কিন্তু তিনি ছালাত ছেড়ে দেননি *(আবুদাঊদ হা/১৯৮; আহমাদ হা/১৪৭৪৫, সনদ হাসান)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, রক্ত বের হ'লে ওযূ করা ওয়াজিব হবে মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। রক্ত কম হোক বা বেশী হোক *(আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রঃ ১/১০৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : এক্সিডেন্টে আহত মুমূর্ষু ছাগল, গরু, মুরগীর ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আলতাফ হোসেন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ প্রাণীর প্রতি দয়া দেখানো কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি চড়ুই পাখি যবহের ক্ষেত্রেও তার প্রতি অনুগ্রহ করে, ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন *(আল-আদাবুল মুফরাদ, ছহীহাহ হা/২৭)*। কিন্তু প্রাণীটি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকলে যবেহ করে খেয়ে নিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৬/১৭৮)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : কোন কোন আলেম জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরে এটাকে ইসলামের ৬ষ্ঠ রুকন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এটা সঠিক কি?

-আব্দুর রহীম, গন্ধর্বপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : আরকানুল ইসলাম ৫টি *(বুখারী হা/৮)*। এখানে যোগ-বিয়োগের কোন সুযোগ নেই। কুরআন-হাদীছ বা সালাফে ছালেহীন থেকে জিহাদকে ৬ষ্ঠ রুকন হিসাবে আখ্যায়িত করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে হুযায়ফা (রাঃ)-এর একটি আছার পাওয়া যায়। যেখানে তিনি জিহাদকে ইসলামের আটটি অংশের একটি হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হ'ল যার কোন একটি অংশ নেই' *(আবু ইয়া'লা হা/৫২৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৪১, সনদ হাসান)*।

তবে জিহাদ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'ফরয ইবাদতের পরে জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল অন্য কিছু জানি না *(মুগনী ৯/১৯৯)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'আমার জানা মতে আলেমদের ঐক্য রয়েছে যে, নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৪১৮)*। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্র রয়েছে। যা বিবেচনায় না নেয়ায় অনেকেই বিভ্রান্তিতে পতিত হন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর যুগে উদ্ভূত ফিৎনার সময় এক ব্যক্তি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আপনি এক বছর হজ্জ করেন এবং এক বছর ওমরাহ করেন। অথচ আল্লাহ্র পথে জিহাদ ত্যাগ করেছেন? নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ এই জিহাদ সম্পর্কে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন! ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, হে ভাতিজা! ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত প্রতিষ্ঠা, রামাযানের ছিয়াম পালন, যাকাত প্রদান ও হজ্জ পালন (অর্থাৎ তিনি যেন বুঝাতে চাইলেন যে, জিহাদ ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে নয়)। তখন সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে কী বলেছেন তা আপনি শুনেননি? ..অতঃপর সে সূরা হুজুরাতের ৯ এবং আনফালের ৩৯ আয়াত পাঠ করল। (আয়াতদ্বয় শ্রবণ করার পর) ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা এ কাজ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীগণ স্বল্প সংখ্যক ছিল। যদি কোন ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে ফিতনায় পতিত হ'ত, তখন হয় তাকে হত্যা করা হ'ত অথবা শাস্তি প্রদান করা হ'ত। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোন ফিতনা রইল না (অর্থাৎ আর যুদ্ধের প্রয়োজন রইল না) *(বুখারী হা/৪৫১৪)*।

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, জিহাদ অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল হওয়া সত্ত্বেও ইবনু ওমরের হাদীছে জিহাদের কথা উল্লেখ নেই *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৫২)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : শালা-শ্যালিকা, তাদের স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানেরা কোন পর্যায়ের আত্মীয়? তাদের সাথে সাধারণ মুসলিম ভাইয়ের মত আচরণ করলেই যথেষ্ট হবে কি?

-এস. আহমাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উপরোক্ত ব্যক্তিরা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। আত্মীয় তিন ধরনের। পিতৃ বংশগত, শ্বশুর বংশগত বা বৈবাহিক সূত্রের ও দুগ্ধসম্পর্কীয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। এছাড়া দুগ্ধসম্পর্কীয় আত্মীয়ও রয়েছে। যারা বংশগত আত্মীয়ের ন্যায় *(নিসা ৪/২৩)*। শ্যালক-শ্যালিকা হ'ল শশুর বংশগত বা বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ তাদের স্ত্রী ও স্বামীরাও। তাই তাদের সাথে সুসম্পর্ক

বজায় রাখতে হবে। বিনা কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯২২)*। তবে দ্বীনী কারণে সাময়িকভাবে কাউকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : রাসূল (ছাঃ) জিন জাতির মাঝে দ্বীন প্রচার করেছিলেন কি?

-মানিক হোসাইন, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) জিন জাতির নিকটও ইসলাম প্রচার করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেননি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনে সাক্ষাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতেন? *(আন'আম ৬/১৩০)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানব ও জিন সহ সমস্ত সৃষ্টির নিকটে নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন *(মুসলিম হা/৫২৩; তিরমিযী হা/১৫৫৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮)*।

মুমিন জিনগণ রাসূল (ছাঃ) সহ সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করতেন। আল্লাহ বলেন, তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল হয়েছে। যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়ন করে। যা সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে *(আহক্বাফ ৪৬/৩০)*। এছাড়া জিনেরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, জিনদের একটি দল তার কাছে এসে কুরআন শ্রবণ করে বলেছিল যে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি *(জিন ৭২/১)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'একবার আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। ...(অবশেষে তাকে খুঁজে পেলে) তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম'। ...অতঃপর বললেন, তোমরা শুকনা হাড্ডি ও গোবর ইস্তিঞ্জাকালে ব্যবহার করো না। এগুলি তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য' *(মুসলিম হা/৪৫০)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : আমার ছোট ভাই হিন্দুর মেয়েকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামী বিধি মোতাবেক বিবাহ করেছে। এক্ষণে মেয়ের পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের অন্যান্য হিন্দু সদস্যদের সাথে কিরূপ আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত?

-রোকনুযযামান, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের সাথে উঠা-বসা, দাওয়াত আদান-প্রদান করা যাবে। তবে তাদের যবেহকৃত পশু-পাখি খাওয়া যাবে না *(আন'আম ৬/১২১)* এবং তাদের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করা যাবে না *(ফুরকান ৭২; আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : জমাকৃত বায়তুল মাল থেকে টাকা উত্তোলন করে গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া বা তাদের দেওয়ার জন্য সুফারিশ করা যাবে কি?

-মকবূল হোসেন, কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আত্মীয় হৌক বা অনাত্মীয় হৌক প্রকৃত হকদার হ'লে তাকে দেওয়া যাবে এবং তাকে দেওয়ার জন্য সুফারিশ করা যাবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হ'লে তিনি বলতেন, তোমরা সুফারিশ কর ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা তাঁর নবীর মুখে চূড়ান্ত করেন *(বুখারী হা/১৪৩২)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : শেষ যামানায় ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করে কত বছর অবস্থান করবেন?

-রায়হান কবীর, আদাবর, ঢাকা।

উত্তর : ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর মাঝে কোন নবী নেই। ...তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করবে' *(আহমাদ হা/২৪৫১১; আবূদাঊদ হা/৪৩২৪; ছহীহাহ হা/২১৮২)*। তবে কোন কোন বিদ্বান মুসলিমের একটি বর্ণনার ভিত্তিতে ঈসা (আঃ)-এর অবস্থানকালীন সময় সাত বছর বলেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করার পর লোকেরা সাত বছর অবস্থান করবে *(মুসলিম হা/২৯৪০)*। কিন্তু এখানে হাদীছটির অর্থ হবে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর মানুষ সাত বছর অবস্থান করবে, যা মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যেখানে বলা হয়েছে ثُمَّ يَلْبَثُ النَّاسُ بَعْدَهُ سِنِيْنَ سَبْعًا 'তার পরে লোকেরা সাত বছর অবস্থান করবে' *(আহমাদ হা/৬৫৫৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : ব্যাংকে যদি কারো ৪ লক্ষ টাকা জমা থাকে এবং প্রতি মাসে সে ১০ হাযার টাকা করে জমা করতে থাকে। তবে প্রতিবছর সে কিভাবে যাকাত দিবে? কারণ প্রতিমাসেই তো তার টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

-ছাদিক, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে প্রতিবছর নির্দিষ্ট একটি সময়ে জমাকৃত পুরো অর্থের উপর যাকাত বের করলেই যথেষ্ট হবে। সেক্ষেত্রে কিছু অর্থের উপর বছর পূর্ণ না হ'লেও অসুবিধা নেই। বরং তা অগ্রিম যাকাত হিসাবে গণ্য হবে। যাকাত দানকারীর জন্য এটাই নিরাপদ ও প্রশান্তিদায়ক পদ্ধতি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/২৮০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : জনৈক আলেম বলেন, আলেমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করলে জাহান্নামে যেতে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-লোকমান, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে হাদীছে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তার দ্বারা সে আলেমদের সাথে বিতর্ক করবে ও মূর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করবে কিংবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন *(তিরমিযী হা/৩১৩৮, মিশকাত হা/২২৫)*। আর প্রয়োজনে শারঈ বিষয়ে দলীলের ভিত্তিতে শালীনতা বজায় রেখে তর্ক-বিতর্ক করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : বিতরের কুনূতে হাত উত্তোলন করা যাবে কি?

-সুলতান, মীরের চক, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ, আনাস, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে। মুহাদ্দিছগণ এর দ্বারা কুনূতে বিতর বুঝেছেন *(বায়হাক্বী ২/২১১-১২, মির'আত ৪/৩০০; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫৬৭, ইরওয়াউল গালীল ২/১৮১)*। তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বিতর ছালাতে হাত উঠাতেন এবং দো'আ করতেন *(বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৫২)*। ইবরাহীম নাখঈ বিতরের কুনূতে হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৫০০১)*। ইমাম আহমাদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, কুনূতে নাযেলার উপর ক্বিয়াস করে কুনূতে রাতেবাতেও হাত উঠিয়ে দো'আ করা যায় *(মারওয়াযী, মুখতাছার কিয়ামুল লায়ল ১/৩১৮)*। শায়খ বিন বায বলেন, বিতরের কুনূতে হাত উত্তোলন করা শরী'আত সম্মত। কেননা তা কুনূতে নাযেলার মতই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/৫১)*। উছায়মীন বলেন, ওমর (রাঃ) হ'তে ছহীহ সূত্রে বিতরের ছালাতে হাত উঠানোর বর্ণনা রয়েছে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৮১)*। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন *(মির'আত ২/২১৯; ঐ, ৪/৩০০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : অল্পমূল্যে অনেক ভালো ভালো কোম্পানীর ব্যবহৃত মোবাইল ক্রয়ের স্থান রয়েছে, যার অধিকাংশই চুরিকৃত বলে অনুমান করা হয়। এসব মোবাইল ক্রয় করা যাবে কি?

-আবু রায়হান, নাচোল, রাজশাহী।

উত্তর : নিশ্চিতভাবে জানা গেলে চুরিকৃত বস্তু ক্রয় করা যাবে না। এটা অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(সূরা মায়েদা ৫/২; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৯২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : আমি পূর্ণ পর্দার সাথে মেডিকেলে পড়াশুনা করি। দ্বীনদার হওয়া সত্ত্বেও আমার পিতা আমাকে নেকাব ব্যবহারে নিষেধ করেন। শুনেছি নেকাব ব্যবহার করা নারীর জন্য আবশ্যক নয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-শায়লা, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।

উত্তর : নারীর জন্য নেকাব ব্যবহার করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, 'মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণভাবে প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত' *(নূর ২৪/৩১)*। নারী সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল হ'ল তার মুখমণ্ডল। সেকারণ নিষেধ থাকা সত্ত্বেও হজ্জের সময়ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ বেগানা পুরুষ দেখলে মুখ ঢাকতেন *(বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৮৮৩২; ইরওয়া হা/১০২৩; মিশকাত হা/২৬৯০, সনদ ছহীহ)*। অতএব পিতাকে বুঝিয়ে নেকাব পরিধান করে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : বেকার স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপার্জন থেকে পরিবার পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় করা জায়েয হবে কি?

-আবু হানীফ, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তর : স্ত্রীর সম্মতি থাকলে জায়েয হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে খরচ করলে দ্বিগুণ নেকী পাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মিসকীনকে ছাদাক্বা দিলে একটি ছাদাক্বা হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। এক-ছাদাক্বা এবং দুই-আত্মীয়তা *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৩৯)*। যয়নব (রাঃ) স্বীয় স্বামী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে যাকাতের অর্থ দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, এতে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। (১) ছাদাক্বার নেকী (২) আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার নেকী' *(বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : ১টি ছাগল কুরবানী দিলে যে গোশত পাওয়া যায়, তা বড় পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষণে প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঈদের পূর্বে গোশত ক্রয় করে রাখা জায়েয হবে কি?

-শামীম, পাশুণ্ডিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নের সাথে কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এখানে প্রশ্ন হ'ল গোশত বেশী পাওয়ার জন্য। পক্ষান্তরে কুরবানী হ'ল আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম। অতএব সামর্থ্য থাকলে বড় পরিবারের জন্য বড় পশু বা একাধিক পশু কুরবানী দিবে। আল্লাহ বলেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। এখানে গোশতে ঘাটতি পড়ার চিন্তা করা উচিত হবে না। কারণ আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের কুরবানী কবুল করে থাকেন *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : ওলী ছাড়া বিবাহের পর ১টি সন্তান হয়েছে। সন্তান জন্মের পর মেয়ের পিতা-মাতা উক্ত বিবাহ মেনে নিয়েছেন। এক্ষণে ঐ সন্তানটি কি জারজ হিসাবে গণ্য হবে? সে কি পিতা-মাতার সম্পদের অংশীদার হবে?

-আব্দুন নূর, ফরিদপুর।

উত্তর : যদি কেউ সাক্ষী ও ওলী ব্যতীত গোপনে কাউকে বিবাহ করে, উক্ত বিবাহ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত। তবে যদি তারা একান্তই বিবাহ জায়েয হয়েছে মনে করে সহবাস করে, সেক্ষেত্রে তাদের একত্রবাস 'সন্দেহপূর্ণ' বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় সন্তান পিতার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং পিতার সম্পদে ওয়ারিছ হবে। তবে এরূপ সম্পর্কের জন্য পিতা-মাতা উভয়ে ইসলামী আদালত কর্তৃক শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১০৩)*। এক্ষণে উভয়কে কৃত অপরাধের জন্য একনিষ্ঠ চিত্তে তওবা করতে হবে এবং নতুনভাবে নিয়মমাফিক তাদের বিবাহ পড়াতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : মাথা ও পা বিহীন প্লাস্টিক ডল দিয়ে গার্মেন্টস ব্যবসা করা যাবে কি?

-ইউসুফ আলী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এগুলি মূর্তিপূজার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করে। অতএব এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে প্লাষ্টিক বা অন্য বস্তুর দ্বারা পূর্ণদেহী পুতুল তৈরী করা হয়। যার মুখ, চোখ, নাক, কান সহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হুবহু মানুষের বা প্রাণীর আকৃতির ন্যায়। এ ধরনের পুতুল অবশ্যই বর্জনীয়।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

অনেক মুসলমান ছিলেন। অথচ মিয়ানমারের বর্তমান প্রধান সেনাপতি জেনারেল মিন অং হেইং এবং অং সান সুচি উভয়েই জাতিগত ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে কার্যত বার্মার রাজনৈতিক ইতিহাসকেই অস্বীকার করলেন। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এমন কোন ভূখণ্ড পাওয়া যাবে না, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সহাবস্থান করছে না। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরাই কেবল তাদের হীন স্বার্থে এগুলোকে ইস্যু করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়েদা লুটে থাকে।

বার্মার সেদিনের সেই ঐক্যচেতনাকে প্রথম দ্বিধাবিভক্ত করতে চেষ্টা চালায় বার্মার তৎকালীন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ। সেদিন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মধ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বর্বর দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির মূলে ইসরাঈলী গোয়েন্দা বাহিনীর একটি ঘৃণ্য ভূমিকা ছিল। তারা যে শ্লোগানটি চালু করার চেষ্টা চালায় তা ছিল 'বার্মা ফর বার্মিজ বুডটিষ্টস'। অর্থাৎ বার্মা শুধু বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য। এর ফলে বার্মায় শত শত বছর ধরে বসবাসকারী মুসলমান রোহিঙ্গাদের বহিরাগত প্রমাণের অপচেষ্টা চালানো হয়। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সে ধারাবাহিকতায়ই যে বার্মার সেনাবাহিনী ও এক শ্রেণীর উগ্র বৌদ্ধ ধর্মনেতাদের দ্বারা রোহিঙ্গা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। যারা আজও বার্মিজ সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করছে ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে এইসব ভেটোধারীরা সারা বিশ্বের স্বাধীন মানুষের টুটি চেপে ধরে রেখেছে।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের প্রথম ও প্রধান শর্ত হ'ল মিয়ানমারে তাদের স্ব স্ব ভিটেমাটিতে ফেরত নেওয়া ও তাদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা। ২২শে সেপ্টেম্বর'১৭ শুক্রবার সকালে জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে যে ৫টি প্রস্তাব রেখেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। সারা দেশ তার সঙ্গে একমত। প্রস্তাবগুলি হ'ল : (১) অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করা। (২) অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা। (৩) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় সমূহ (Safe zones) গড়ে তোলা। (৪) রাখাইন রাজ্য হ'তে যোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। (৫) কফি আনান কমিশনের সুফারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা'। বিশ্বসভার দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। অতএব এখনই সুযোগ ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো। যদি তাতে সুফল না আসে, তাহ'লে ১৯৭১ সালে নিপীড়িত বাংলাদেশীদের স্বাধীনতার পক্ষে ভারতের যে ভূমিকা ছিল, বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতার পক্ষে বাংলাদেশকে সেই ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য '৭১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে যেভাবে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সেটি সরকারের মনে রাখা কর্তব্য।

এখানে শরণার্থীদের বিষয়ে আমাদের একটি প্রস্তাব রয়েছে। জেলখানার মত এক জায়গায় বন্দী না রেখে তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও রূযী-রোযগারের সুযোগ দেওয়া উচিৎ। এ বিষয়ে আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত দেশ উগাণ্ডা সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হ'তে পারে। বর্তমানে সেখানে ৯ লক্ষ ৪০ হাযার শরণার্থী রয়েছে। সে দেশ থেকে কোন শরণার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। বেশ কয়েকটি কারণে উগাণ্ডার শরণার্থী নীতি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয়। শরণার্থীরা উগাণ্ডায় এলে তাদের শরণার্থী শিবিরে রাখা হয় না। তার বদলে একখণ্ড জমি দেওয়া হয়। যে জমিতে তারা বসবাস করতে পারবে এবং কৃষিকাজ করে নিজেদের খাবার নিজেরাই উৎপন্ন করে নিতে পারবে। উগাণ্ডায় শরণার্থীরা প্রবেশ করলে তাদের প্রত্যেককে একটি করে আইডি কার্ড দেওয়া হয়। এতে তারা আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ কার্ড ব্যবহার করে তারা উগাণ্ডার ভেতরের যে কোনো স্থানে নিজেদের ইচ্ছামতো যাতায়াত করতে পারে। যেকোন চাকরী করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে, নিজেদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারে। উগাণ্ডাতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকেই শরণার্থীদের খোঁজখবর রাখা হয়। শরণার্থীরা চাইলেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফোন করতে পারে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানিয়ে'। সরকার বিষয়টি বিবেচনা করলে বাধিত হব।

পরিশেষে দেশবাসী এবং বিশ্বের সর্বত্র ঈমানদার মুসলমানগণের প্রতি আমাদের আবেদন, নিয়মিত কুনূতে নাযেলা পাঠ করুন। যেন আল্লাহ পাক স্বীয় গায়েবী মদদে মিয়ানমার সহ বিশ্বের সর্বত্র নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষা করেন।- আমীন! *(স.স.)*।

নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন!

একাউন্ট নং

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল
হিসাব নং- ০০৭১১২০০৫৪৩৪০
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ নং

০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ০১৯৭৮-২৫০২৫১,

ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক (রকেট)

০১৭১১-৫৭৮০৫৭২, ০১৯৭৮-২৫০২৫১৩

সার্বিক যোগাযোগ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।
ইমেইল : ahlehadeethandolon@gmail.com

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রিন্সিপ্যাল আবশ্যক

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত সাতক্ষীরাস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ-এর জন্য একজন প্রিন্সিপাল আবশ্যক।

যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

সুযোগ-সুবিধা : সম্মানজনক বেতন, পরিবার সহ বসবাস করার মত আবাসিক ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমলসম্পন্ন দ্বীনী পরিবেশ।

বিঃ দ্রঃ প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য। বয়স ৩৫-৫০ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে স্বহস্তে লিখিত আবেদন, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৯ই নভেম্বর ২০১৭।

যোগাযোগ

সেক্রেটারী, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।
মোবাইল : ০১৭১৮-৫৫৩৮২৫, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩।